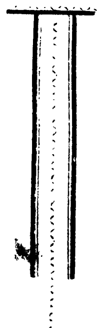
সীমা

শ্রীউষারাণী দেবী



বান্ধব পুস্তকালয়
১৭, শিবপুর রোড,
হাওড়া।

প্রকাশক—
শ্রীমণিমোহন মিত্র
বান্ধব পুস্তকালয়
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক,
১৭, শিবপুর রোড, হাওড়া।

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস
কল্যাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১-এ, রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



একখানি ইংরাজী উপন্যাসের মূল গল্পাংশটী নিয়ে প্রায় বছর পাঁচেক আগে 'সীমা' লিখেছিলাম।

'সীমা' লিখিবার সময় বহুদিনের পড়া সেই উপন্যাসখানির ঘটনাগুলির কতকাংশ ব্যতীত অপর কিছুই আমার স্মরণ ছিল না। আজও গভীর লজ্জার সঙ্গে আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সেই উপন্যাসখানি বা তাহার লেখকের নাম আমি স্মরণ করিতে পারি নাই।

সীমার মূল গল্পাংশ যদি কাহাকেও আনন্দ দেয়, তাহার কৃতিত্বের সবটুকু গৌরব সেই ইংরাজ-লেখকের।

আমি আপনার রুচিমত ইহার চরিত্রগুলি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছি; তাই ইহার রচনা-সৌষ্ঠব, বাচন-ভঙ্গী যদি কাহারও বিরক্তি আনে, তাহার সবটুকু অপরাধ আমার অক্ষমতার।

১৩৩৭ সালে **'সীমা'** 'নবশক্তি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নবশক্তি'র সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজ রায় চৌধুরী মহাশয় সেদিনের "নবশক্তির" মত বহুপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমার মতো অপরিচিতা ও অখ্যাতনামা লেখিকার লেখা প্রথম উপন্যাসখানি মনোনীত করিয়া, ও সুলেখক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় **'সীমা'** নবশক্তিতে প্রকাশের সময় ও তাহার পরে বহু প্রকারে সহানুভূতি দেখাইয়া যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, **সীমার** পরিচয়-পৃষ্ঠায় তাহা স্বীকার না করিলে আমাকে অকৃতজ্ঞতার অপরাধী হইতে হইবে। ব্যক্তিগত

ভাবে এঁরা উভয়েই আমার অপরিচিত; তাই এঁদের সুব্যবহারের জন্য এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

সীমা লিখিবার পর আমার ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহাতে **সীমা** পুস্তকাকারে প্রকাশের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের কোন অনির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে ছিল। এখন কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত মণি মোহন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টা ও আগ্রহেই **সীমা** সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিল। ইহার জন্য তাঁহার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

শিবপুর
মহালয়া, ১৩৪১

শ্রীউষারাণী দেবী

কমলকে—

সীমা

সীমা

১

সমুদ্রের ধারে ছোট সহরটী স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যে ছিল সে অঞ্চলের সব গুলা সহরের সেরা। তাই নবাগতের ভিড়ে সহরটা প্রায় সব সময়েই থাকত ভরা।

নীল সমুদ্রের কোলে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়টীর বুকে মহারাজ দলমীরের মর্ম্মর শুভ্র প্রাসাদটা ছিল দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টির আর একটি দৃশ্য।

অনন্ত সাগরের চঞ্চল বুকে, শুভ্র ফেনাগুলির এলায়িত গতির কূলে, বিশাল কৃষ্ণকায় বিসর্পিত পাথরের বুকে, শুভ্র ফুলটির মত এই প্রাসাদটা যাহার পরিকল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন অসংখ্য দর্শকের মুগ্ধ মনের অজস্র প্রশংসা তাঁহার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইলেও তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ দলমীরের নিকট এই সুন্দরী পুরী উপেক্ষিতাই রহিয়া গিয়াছে দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া।

এখানকার অধিবাসীরা কেহই এই তরুণ মহারাজকে দেখেন নাই। কিন্তু সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি জনরব শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব সকলেই মনে মনে পোষণ করিতেন।

সাম্য

এখানে অনেকগুলি অভিজাত-বংশীয় বাঙ্গালী পরিবার বাস করিতেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা প্রাচীন অর্থশালী ও গৌরবান্বিত ছিল এই দলমীর রাজবংশ। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী এই চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল মহারাজকে সকলেই এই সম্মানের অযোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। এ অঞ্চলে মহারাজ দলমীরের যে সম্পত্তি ছিল তাহার আয়ের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু এই তরুণ মহারাজ তাহারও কোনও খবর লইতেন না। মৃত মহারাজ বিশ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী দলমীরের মৃত্যুর পর মুরলীবাবুর হাতে সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়া চার বৎসরের বালক বর্ত্তমান মহারাজকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যান। তাহার কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই অবধি সমস্ত সম্পত্তি মুরলীবাবু সততা আর সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করিতেছেন কোনও অদূরদিনে তাঁর বর্ত্তমান প্রভুর হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ আর অনায়াস-শাসিত জমীদারী তুলিয়া দিবার আশায়। কিন্তু কত বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেল, আশা তাঁহার আশাই রহিয়া গেল।

২

সন্ধ্যার অনেক পরে। মুরলীবাবুর শোবার ঘরে শুভ্র শয্যায় তাঁহার পত্নী সরোজিনী শুইয়াছিলেন। কাছেই একখানি চেয়ারে মুরলীবাবু বিমর্ষভাবে বসিয়াছিলেন।

একটু পরে ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। মুরলীবাবু পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তার আসবার সময় তো প্রায় হয়ে এলো। তোমার মাথা ধরাটা একটু কম্‌লো ?" একটা যন্ত্রণা-সূচক শব্দ করিয়া সরোজিনী বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন "মাথা আর আমার কমেছে, এই সব আপদই আমায় শেষ করবে দেখছি। কি জ্বালা বাবা ! তোমার ভাই যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তো আমাদের একবারও মনে করেন নি। এখন মরবার সময় একটা ধেড়ে মেয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে। ওই রকম মায়ের যে মেয়ে সে কি কখনও ভাল হয়, না ওই রকম বাপের কাছে যে মেয়ে মানুষ হয়েছে সে সংসারের কিছু শিখেছে। সব বড়লোকের মধ্যে সভ্য সমাজে আমাদের বাস ; এর মধ্যে কি করে যে তাকে মানিয়ে নেব আমি, তা তো ভেবেই পাচ্ছি না। তোমার ভাইয়ের কি কোনও আক্কেলই ছিল না। মা যার অমন করে চলে গ্যাছে তাকেই এত বয়েস অবধি আইবুড় রেখেছে কোন বিবেচনায় বল তো ?"

মুরলী বাবু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—"সতীশ একটু বেখেয়ালী ছিল বটে কিন্তু তার মনটা ছিল ভারী সাদা, ভারী কোমল, মা মারা যাবার পর সামান্য কারণে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় তারপর আর কোনও

দিন দেখা করলে না !" মুরলী বাবুর স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যথার ঈষৎ আভাস ফুটিয়া উঠিতেই সরোজিনী বলিয়া উঠিলেন—"এখন মেয়ে চাপালেন তো ঘাড়ে। টাকা-কড়ি কিছু রেখে গ্যাছে কিনা কে জানে, মেয়েটা লিখেছে কিছু ?"

মুরলী বাবু বলিলেন—"না, সে সব কিছু লেখেনি, শুধু লিখেছে 'বাবা মারা গ্যাছেন সংসারে আমার আর আশ্রয় নেই তাই আপনার কাছেই যাচ্ছি। শনিবার ওখানে পৌছিব আমি।"

সরোজিনী বলিলেন—"কেমন দেখতে কে জানে চেহারাটা ভাল হলে তবু চেষ্টা করে বিয়েটা দেওয়া যাবে। কিছু টাকার দণ্ড আছে আর কি, এখন চেহারাটা ভদ্র গোছের হলে বাঁচি।"

মুরলী বাবু বলিলেন—"দেখতে হয়তো খুব খারাপ হবে না। সতীশ ভালই ছিল দেখতে, আর ওর মা নাকি ছিল অসাধারণ সুন্দরী।"

সরোজিনী বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মরণ অমন সুন্দরের। ছিঃ ছিঃ কি প্রবৃত্তি বল তো কেমন বংশের মেয়ে কে জানে।"

মুরলী বাবু ঈষৎ বেদনা ম্লান মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া একটি বছর দশেকের ছেলে ঘরে ঢুকিল। শব্দ শুনিয়া সরোজিনী মাথা তুলিয়া বলিলেন—"অনু তোমার খাওয়া হয়েছে।"

অনু মাথা নাড়িয়া জানাইল 'হইয়াছে'। সরোজিনী বলিলেন—"যাও ঝির সঙ্গে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়গে।"

অনু ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আদপ কায়দার পাকা হিসাবী মায়ের সম্মুখে থাকা অপেক্ষা আড়ালে থাকাটাই অনু সব সময় পছন্দ করিত বেশি। সভ্যতা আর শিষ্টতা সম্বন্ধে উপদেশ শুনিতে শুনিতে মায়ের নিকট সন্ত্রস্ত হইয়া অবস্থান করিবার দুর্ভোগ হইতে সে সব সময় পরিত্রাণের পথই খুঁজিত। আজ শুধু একজন অপরিচিতার আগমনের ঔৎসুক্যই তাহাকে আনিয়াছিল বিনা আহ্বানে মায়ের শয়ন-কক্ষে। তাহার সঙ্গীহীন শিশু চিত্ত নিশিদিন চাহিত একটি স্নেহ-কোমল আশ্রয়। এই অপরিচিতার আসা তাহার মনে কি আশা জাগাইয়াছিল কে জানে। মায়ের আদেশে তাহাকে আজ দেখিবার ইচ্ছা দমন করিয়া চলিয়া যাইতে হইল।

৩

অনু চলিয়া যাইবার পরই দাসী আসিয়া বলিল—"যার আসবার কথা ছিল তিনি এসেছেন।"

শুনিয়াই মুরলীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত কণ্ঠে বলিলেন—"এসেছে —কোথায় ?"

সরোজিনী মাথাটা তুলিয়া আধ শোয়া ভাবে বসিয়া বলিলেন— "ব্যস্ত হচ্ছো কেন অতো, বসোনা। যাও ঝি তাকে এখানে ডেকে দাও।" মুরলী বাবু অপ্রতিভভাবে বসিয়া পড়িলেন। দাসী বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে বছর আঠার উনিশের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। মেয়েটীর একখানি সাদা শাড়ীর উপর রেশমী চাদর জড়ানো দেহে অপরূপ রূপের অসীম ঐশ্বর্য্য, মুখে ক্লান্ত কোমলতা, ঘন পল্লব-ছায়ে আবৃত আয়ত দুটী চোখে অজানার আকুলতা। মেয়েটি একটু অগ্রসর হইয়াই দু জোড়া চোখের মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির স্পর্শে কেমন যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সরোজিনী তাহার পক্ষে যতটা সম্ভব গলাটা কোমল করিয়া বলিলেন— 'এসো মা! বসো রাস্তায় খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি ?'

মেয়েটী ধীরে ধীরে সরোজিনীকে প্রণাম করিরা মুরলী বাবুর নিকট নত হইতেই তিনি উঠিয়া দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"থাক থাক। আমাদের কাছে চলে এসে খুব ভাল করেছ

মা, তোমার জ্যাঠাইমার কাছে তুমি খুব ভালই থাকবে। আমাদের মেয়ে নেই, তোমায় পেয়ে আমরা খুব সুখী হয়েছি।"

সরোজিনী এইবার তাঁর অভ্যস্ত গলায় বলিলেন—"আচ্ছা, এখন ওকে ছেড়ে দাও। যাও তুমি কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নাও গে। এখনি আমাদের খাবার দেবে। আমরা সবাই একসঙ্গে টেবিলে খাই, তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?'

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল—'না।'

সরোজিনী বলিলেন—যাও ঝি তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে।

তোমার নামটা যেন কি?

মেয়েটী তেমনি নরম গলায় বলিল—সীমা।

'সীমা'—'সীমা' আবার কেমন নাম বাপু, অল্প হাঁসির সুরে কথা করটা বলিয়া সরোজিনী শুইয়া পড়িলেন। সীমা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মুরলী বাবু এতক্ষণ স্নেহপূর্ণ প্রশংসদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। এখন চোখ ফিরাইয়া পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মেয়েটা কি আশ্চর্য্য সুন্দর। এত বড় বড় ঘরের মেয়েরা থাকেন এখানে, কত আসেন বেড়াতে, এর মত এমন রূপ তো কখনও কারু দেখিনি। সতীশের মেয়ে খুব খারাপ যে হবে না তা জানতুম; তবে এতটা সুন্দর হবে ভাবতেও পারি নি। স্বভাবটাও তো বেশ নরম বলেই মনে হোল—কি বলো তোমার কি মনে হয়।'

সরোজিনী স্বরে বিচক্ষণতার সুর ভরিয়া বলিলেন—"একবার

দেখেই কি মানুষ বোঝা যায়। তবে রূপটা খুব আছে বটে। একটু চেষ্টা করলে বড় ঘরে বিয়েটা হতে পারে, যদি ওর মায়ের গুণটা গোপন রাখতে পারা যায়। দেখি হেঙ্গাম যখন ঘাড়ে পড়লো উপায় একটা করতেই হবে, খরচ হবে কতকগুলা টাকা আর কি।”

মুরলী বাবু উচ্ছাসের মুখে বলিয়া ফেলিলেন—‘তা হোক বংশের মধ্যে ওই একটাই তো মেয়ে, ছোট ভাইটীকে কোনও দিনই তো কিছু করিনি, তারই একমাত্র মেয়ে তার মরবার পর এসেছে আমারই কাছে। ওর জন্যে খরচ কিছু হলেই বা।’

স্বামীর এই বংশ-প্রীতি সরোজিনীর ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—“শুধু টাকাতেই তো সব হয় না। বংশের যা মুখ উজ্জ্বল করেছেন ওর মা তাইতেই তো ভয়।” বহুদিনের বিস্মৃত ভ্রাতৃ স্নেহ যখন মুরলী বাবুর মনে চির বিচ্ছেদের ব্যথায় ভরিয়া, বহুদিনের অবহেলায় অদর্শনের কুণ্ঠায় কাতর হইতেছিল, তখন বার বার তাহারই অভাগিনী পত্নীর আচরণের অভিযোগ পত্নীর নিকট শুনিতে বড়ই বাজিতে ছিল। কিন্তু কিই বা তিনি বলিতে পারেন এর প্রতিবাদে। তাই নিরুত্তরই রহিলেন।

দাসী সীমাকে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে সীমা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

মাঝারি ধরণের ঘরখানি বেশ ঝর ঝরে পরিষ্কার। একজনের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রে মোটামুটি বেশ সাজান। একটী পাশে ছোট একটী আনলায় একখানি সাড়ী আর একটি সেমিজ রাখা আছে; দাসী দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে এ গুলি তারই উপস্থিত ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে। সীমা ইহারই মধ্যে এ বাড়ীর যতটুকু দেখিতে পাইয়াছে তাহাতে তাহার জ্যেঠামহাশয়কে বেশ অর্থশালী, সৌখীন ও শৃঙ্খল-পরায়ণ বলিয়াই মনে হইতেছিল। এই মাত্র জ্যেঠাইমার মুখে তাঁহারা টেবিলেই খান শুনিয়া সীমার মন অনেকটা স্বস্তি পাইল। বিদেশী-ভাবাপন্ন পিতার নিকট সে হিন্দুর ঘরের আচার-নিয়মগুলার কিছুই শিখিতে পারে নাই। ইহার কোনও প্রয়োজন যে কোনও দিন তাহার জীবনে হইতে পারে, এমন কল্পনাও সে কোনও দিন করিয়াছিল কি? কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি মানুষকে কত অচিন্তিত অবস্থারই সম্মুখিন করিয়া দেয় এ অভিজ্ঞতা যখন তাহার হইল তখন নতুন করিয়া কিছু শিখিয়া লইবার অবসর কই। তাই শোকাকুল মন যখন সব কিছু হইতে আপনাকে সরাইয়া শান্তি চায় স্মরণে তখন অপরিচিত এই আত্মীয়ের আশ্রয়ে অনভিজ্ঞতার অপরাধ লইয়া তাহাকে আসিতে হইল একা।

সীমা

সীমা ধীরে ধীরে আপনার সাড়ী সেমিজ বদল করিয়া খোলা জানালাটীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার রাত্রের অস্পষ্টতায় ঢাকা বাহিরে চাহিয়া সীমার মনে হইল এ যেন তাহারই অজানা ভবিষ্যতের মত। যাহা তাহারই সম্মুখে রহিয়াছে অথচ তাহার দেখিবার শক্তি নাই কি আছে ওই অদেখা অবাধ বিস্তৃতির মাঝে।

সুদীর্ঘ পথে বিচিত্র ব্যস্ততার পর এতক্ষণে সে আপনাকে পাইল একা। অপরিচিত এই পরিধির মধ্যে কেমন করিয়া আপনাকে মানাইয়া লইবে এই চিন্তার সঙ্গে সীমার মনে পড়িল সর্ব্ব-নির্ভর পিতাকে।

মাত্র কয়টী দিন তাঁহাকে হারাইয়া সীমা দেখিয়াছে সংসারের সত্যকার রূপ। তাই সীমা ভাবিতেছিল বিশ্বের এই যে বিরাট গহ্বর যাহা আজ নিশিদিন তাহাকে শুধু গ্রাস করিতেই চাহিতেছে একখানি স্নেহ কোমল মুখ কেমন করিয়া এতদিন ইহাকে ঢাকিয়াছিল। মাত্র দুইখানি স্নেহ সতর্ক বাহু পৃথিবীর এই অকরুণ বিরুদ্ধতাকে আড়াল করিয়া কেমন করিয়া তাহার জন্য নিরাপদ নীড় রচিয়াছিল।

সীমা ভাবিতে লাগিল—নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে জীবিতদের জন্য অকুল ভাবনার আকুলতা বহিয়া যাহারা চলিয়া যায় মৃত্যুর পারে তাহাদের বেদনার পরে বিস্মৃতি কি নামিয়া আসে? এই মর্ত্তদেহের অবসানে শেষ হয়ে যায় ধরণীর সমস্ত বন্ধন। কে বলিয়া দিবে। সীমার সমস্ত মন বলিয়া উঠিল না, না। সীমা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া বলিতে লাগিল— 'আমি জানি আজও তুমি আছ আমার দৃষ্টির অন্তরালে আমার পরে তেমনি স্নেহ সতর্ক দৃষ্টি ফেলে। তারই শক্তিতে আজও আমি সহ্য করবো আমার অনাগত ভবিষ্যতকে।' নিঃশব্দে সীমার চোখ দিয়া সারাদিনের

লঞ্চিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

একটু পরে ঘরের দরজাটী একটু খুলিয়া অনু আস্তে আস্তে বলিল—'আমি আসতে পারি?'

ছোট ছেলের স্বর শুনিয়া সীমা মুখ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল 'এসো।'

অনু সন্তর্পণে দোরটী খুলিয়া খুব মৃদু পায়ে সীমার কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল—'আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলুম তুমি মাকে বলে দেবে না তো? তোমাকে দেখবার এত ইচ্ছে হোল কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারলুম না। রোজ এমন সময় ঘুমিয়ে পড়ি আজ তুমি আসবে শুনে ঘুম কিছুতে আসছিল না। তুমি মাকে বলবে না তো?'

সীমা মৃদু হাসিয়া বলিল—'তোমার মাকে তো আমি জানিনা। অনু বলিল—'ওই তো নীচে যাঁর সঙ্গে কথা কইলে উনিই তো আমার মা। তুমি আসা অবধি আমি জেগে থাকবো, খেয়ে উঠে মাকে বলবার জন্যে গিয়েছিলুম, কিন্তু উনি যা গম্ভীর হয়ে বল্লেন শুতে আসতে আমি আর কিছু বলতে পারলুম না।'

সীমা চুপ করিয়া এই সুন্দর বালকটীর কথাগুলি শুনিতেছিল। কালো কোঁকড়া চুলে ঘেরা শুভ্র মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি, সীমার মনে যেন স্নেহের দাবী জানাইতেছিল। তাহার ব্যথাতুর মন এই অপরিচিত আবেষ্টনে এমন একটি বালকের দেখা পাইয়া যেন ঈষৎ আনন্দ পাইল। সে একটু অগ্রসর হইয়া অনুকে দুহাতে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি অনেক কথাই বল্লে, কিন্তু তোমার নামটা তো এখনও বল্লে না।'

৫

শরতের শেষ বেলায় সোনালী রোদটুকু প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছে। এমনি সময় সীমা সমুদ্রের ধারে বসিয়াছিল। দৃষ্টি তার সম্মুখে সমুদ্রবক্ষে উত্তাল উর্ম্মিমালার উত্থান পতনের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই ছল ছল নীলাভ নয়ন দুটিতে সম্মুখের দৃশ্য দর্শনের কোনও নিদর্শন ছিল না। তাহার দৃষ্টি যেন অতীতের কোন স্মৃতি-সায়রে অবগাহন করিতেই তন্ময় হইয়াছিল।

অল্প দূরে অনু আপন মনে ছুটিতেছিল। জীবনে এই প্রথম সে এমন-ভাবে ছাড়া পাইয়া কি করিয়া যে ইহাকে উপভোগ করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সীমা আসিয়া অবধি রোজই সকাল বিকাল অনুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত। সরোজিনী ইহাতে অবশ্য সন্তুষ্ট মনে সম্মতি দেন নাই। তবে মুরলীবাবুর অনুরোধে প্রথমেই সীমাকে কিছু বলিতেছিলেন না।

সীমা সেটা বুঝিত। কিন্তু অনুর একান্ত আগ্রহের অনুরোধ না শুনিয়া পারিত না। এই বালকটির সঙ্গীহীন বন্দীজীবন তাহাকে বেদনা দিত।

দেখিতে দেখিতে রোদটুকু মিলাইয়া গেল। সীমা অনুকে ডাকিবার জন্য উঠিতেই বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার অন্যমনস্কতার মধ্যে যে রুমালখানি তাহার কোলের উপর পড়িয়াছিল সেখানি মাটিতে পড়িয়া গেল। সীমা

াত হইয়া সেখানি কুড়াইয়া উঠিবার আগে একটা দমকা হাওয়া সেখানিকে ম্মুখের দিকে উড়াইয়া লইয়া গেল।

সীমা ব্যস্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইতেই দেখিল এতক্ষণ তাহার ম্মুখে যে মাছ ধরা নৌকাখানি রাখা ছিল তাহারই আড়াল হইতে একটি লাক বাহির হইয়া রুমালখানি ধরিয়া তাহার দিকে হাসিমুখে াসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সীমা বিস্মিত হইয়া ভাবিল—'ওর আড়ালে লাক ছিল কি আশ্চর্য্য। কতক্ষণ ওখানে বসে ছিল কে জানে। সীমা ঈষৎ লজ্জিত কুণ্ঠিতভাবে অল্প অগ্রসর হইতেই লোকটী কাছে আসিয়া ামিল। সীমা তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে ইল জীবনে যত চেনা অচেনা মুখ সে দেখিয়াছে এমন আশ্চর্য্য সুন্দর াহার একটিও নয়। সব চেয়ে সুন্দর তার উজ্জ্বল অতল রহস্যময় টি চোখ। মুহূর্ত্ত পরেই মুগ্ধ সীমা দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া বলিল— আপনাকে কষ্ট দিলুম'।

সুমিষ্ট হাসির সঙ্গে অপরিচিত উত্তর দিল—'মোটেই না আমি উঠবোই ভাবছিলুম।'

কথা কয়টি বলিয়াই সে রুমালখানি সীমার দিকে বাড়াইয়া দিল। ীমা সে খানি লইতে লইতে ভাবিতেছিল এমন মিষ্টস্বর সে কখন শুনিয়াছিল কিনা। সীমাকে ঈষৎ বিপন্নভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইতে দেখিয়া লাকটী অনুর দিকে চাহিয়া বলিল—"ওটি বুঝি আপনার ভাই? বেশ ছলেটী।"

সীমা অন্যমনস্কভাবে বলিল—"ভাই, হ্যাঁ, ও আমার ভাই।" লোকটী ালিল—"আচ্ছা এখানে এই সমুদ্রের ধারটাই তো সব চেয়ে সুন্দর?

আর এখানে কি আছে দেখবার মত।" সীমা বলিল—"আমি ও বিষয় আপনাকে কিছুই বলতে পারবো না। আমি এখানে মাত্র সাত দিন এসেছি।" লোকটী বলিল—"ওঃ আপনারাও বুঝি বেড়াতে এসেছেন?" সীমা উত্তর দিল—"শুধু আমিই নতুন এসেছি। আমার জ্যেঠামহাশয় এইখানেই থাকেন। আমার বাবা মারা গ্যাছেন তাই তাঁর কাছে আমি থাকতে এসেছি।"

শেষের কথাগুলিতে সীমার অগোচরে এসেছিল তার গোপন বেদনার ঈষৎ আভাষ। সেই স্বর এই অপরিচিতের মনে এনে দিল এই পিতৃহারা আশ্রয়-প্রত্যাশী বালিকার প্রতি মমতা। সে সীমার শান্ত বিষণ্ণ মুখের পানে কেমন যেন সান্ত্বনামাখা সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিতেই সীমা বলিল —'সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল এবার যাই!'

লোকটী কিছু বলিবার আগেই অনু ছুটিয়া আসিয়া সীমাকে একজন অপরিচিতের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া একটু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটী অনুর নিকটে আসিয়া বলিল—'কি খোকা, তোমার নাম কি? আমি তোমাদের দেশে এসেছি বেড়াতে। এখানে কি কি দেখবার আছে বল তো?'

অনু বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—'নাম আমার অনুপম রায়; সবাই ডাকে অনু বলে। দেখবার এখানে অনেক জিনিষ আছে। সামনেই তো অই দলমীর প্রাসাদ। আজ যে সন্ধ্যে করে এলেন, না হলে দেখাতুম আপনাকে। ওই বাড়ীটা এত সুন্দর যে পৃথিবীতে কোথাও নেই অমন। আপনার মত কত লোক রোজ আসে এখানে দেখতে। আর জানেন কি মজা যার নিজের বাড়ী ওটা, সেই রাজাটাই দেখেনি।' সীমা

এতক্ষণ মৃদু হাসির সঙ্গে অনুর কথা বলিবার ভঙ্গীগুলি দেখিতেছিল। এইবার বলিল—'থাক অনু, তোমার ও রাজার গল্প আর শেষ হবে না। ও দিকে তোমার মা বকবেন, দেরী হয়ে গেল।' লোকটী সীমার দিকে চাহিয়া বলিল—'কত দূরে আপনাদের বাড়ী।'

সীমা উত্তর দিবার আগেই অনু বলিল—'বেশী দূর নয়, ওই পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে তারি নীচে। এক মিনিটও লাগে না যেতে। তা হলে কি হবে, মা যে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকলেই বকেন।'

সীমা অনুর হাত ধরিয়া বলিল—'আর নয় অনু চলো।' অনু অনিচ্ছায় অগ্রসর হইতেই সীমা লোকটীর দিকে ফিরিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল—'আচ্ছা, চলি এখন।'

লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটী কপালের কাছে তুলিতে তুলিতে বলিল 'চলুন, আমি ওই দিকেই যাবো।'

অনু এইবার উৎসাহে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—'বেশ হবে চলুন। আপনার কি নাম? কি বলে ডাকবো আপনাকে বলুন তো?'

লোকটী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আমার নাম হিরণ। তুমি আমায় হিরণ দা' বলো, কেমন!'

অনু মহা আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া এই সুদর্শন লোকটীকে দাদাত্বে বরণ করিয়া বকিতে বকিতে চলিল। দাদাটীও মহা আগ্রহে তাহার যথাসম্ভব উত্তর দিতে লাগিল। সীমা মৃদু হাসির সহিত শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। 'দলমীর প্রাসাদে'র নীচে আসিয়া অনুর কথা আবার আশ্রয় করিল সেই অদেখা অদ্ভুত মহারাজকে। সে বলিল—'সবাই বলে মহারাজ খুব খারাপ, খুনে। আমি বলি তার উপর আবার বোকাও; না হলে এমন

সুন্দর জিনিষ চোখেই দেখলে না। আপনি কি বলেন হিরণ দা।' হিরণও হাসিয়া স্বীকার করিল তাহারও তাহাই বিশ্বাস। সীমা ধীরে ধীরে বলিল—'তাঁর সম্বন্ধে যা সব শুনি তা' সবই সত্য কিনা জানিনা। তবে মহারাজ খুব কঠোর প্রকৃতির নিশ্চয়, তা না হলে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষের এত বড় দান এমন অবহেলায় ফেলে রাখতে পারতেন না।'

হিরণ ধীরে ধীরে উত্তর দিল—'কিন্তু তাঁকে দেখলে সে রকম মনে হয় না।' সীমা অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল—'আপনি তাঁকে চেনেন নাকি? হিরণ উত্তর দিল—'আমি একজন সামান্য লোক, তিনি মহারাজ, আমার পক্ষে তাকে যতটুকু চেনা সম্ভব। তাঁর এখানকার বাড়ীতে যে লাইব্রেরী আছে তাতে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বই আছে শুনে আমি সে গুলি একবার পড়বার সুযোগ চেয়েছিলুম তাঁর কাছে। শোনা মাত্র তিনি তাঁর এখানে যে ম্যানেজার থাকেন তাঁর নামে আমার কাছে চিঠি দিলেন আমাকে তাঁর প্রাসাদে থাকবার আর বইগুলি পড়বার সুবিধা করে দেবার জন্য।'

অনু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'বাঃ আপনি তো তা' হ'লে আমার বাবার নামেই চিঠি এনেছেন। চলুন এখন আমাদের বাড়ী।' হিরণ বিস্মিত স্বরে বলিল—'তাই নাকি? তোমার বাবাই মহারাজের সব দেখা শোনা করেন? ভালই হলো, কিন্তু আজ আর যাব না, কাল সকালে কখন তিনি বাড়ী থাকেন বলো; কোনদিকে বাড়ীটা তোমাদের বলো তো?'

অনু বলিল—এই তো আর একটু গেলেই বাঁ দিকে সবুজ রেলিং

ঘেরা বাগানের মধ্যে হলদে রংয়ের বাড়ীটা। সকালে আটটার সময় বাবা বাইরে আসেন তখন যাবেন। ঠিক যাবেন কিন্তু, আমি গেটেই দাঁড়িয়ে থাকবো, আপনার চিনে নিতে কষ্ট হবে না, বুঝলেন। নিশ্চয় যাবেন।'

সীমা এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল এইবার অনুকে টানিয়া বলিল—'এসো অনু রাত হয়ে গেল।' অনু আবার হিরণকে কাল নিশ্চয় যাইবার জন্য বলিয়া চলিতে লাগিল। সীমা একটু চলিয়াই ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—'আজ রাত্তিরে কোথায় থাকবেন?' সুন্দর একটু হাসিতে হিরণের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মধুর সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে সে উত্তর দিল—'কাছেই একটা হোটেলে সকালে উঠেছি। সেইখানেই এখন ফিরে যাব। আচ্ছা আজ আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে, কাল আবার দেখা হবে।' হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল—যতক্ষণ তাদের দেখা গেল হিরণ চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে অন্য পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

৬

সরোজিনীর শরীরটা আজ ভালই ছিল। তাই বসিবার ঘরে একখানি আরামকেদারায় অর্দ্ধশায়িতা ভাবে তিনি মুরলীবাবুর সহিত কথা বলিতেছিলেন। সীমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থার বিষয় তাঁহারা আলোচনা করিতেছিলেন। সরোজিনী সীমার নিকট শুনিয়াছিলেন সীমার পিতা যে অর্থ সীমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। শুনিয়া মৃতের প্রতি দোষারোপটা কথঞ্চিৎ কমিলেও, সীমাকে এতদিন অবিবাহিতা রাখা যে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, সুযোগ পাইলেই তাহা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না।

আজও তিনি বার বার এই অন্যায়ের উল্লেখ করিয়া নিজে যে তাহার প্রশ্রয় দিবেন না, স্বামীকে তাহাই বলিতেছিলেন।

যে মাতার কন্যা সীমা, তাহাকে বেশীদিন কুমারী রাখিলে কি কি অন্যায় তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে তাহাই তিনি মুরলীবাবুকে বুঝাইতেছিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া নিরুপায়ভাবে কথাগুলি শুনিয়া মুরলীবাবু হতাশ ভাবে উত্তর দিলেন—'সবই তো বুঝলুম। কিন্তু হঠাৎ এখনই ভাল পাত্র পাই কোথায়? অমন মেয়ে, ওকে তো যার তার হাতে দেওয়া যায় না। ওর বাপ যখন অত টাকা রেখে গ্যাছে, বিয়ে ওর ভাল দেখেই দিতে হবে তো?'

বেশ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া সরোজিনী বলিলেন—'সে সবও আমি ভেবেছি। দায় যখন ঘাড়ে পড়েছে উদ্ধারের একটা উপায় তো

ভাবতে হবেই। এই ভাবনাতেই তো ক'দিন মাথা ধরাটা এত বেড়েছিল। আজ একটা ঠিক করে তবে একটু সুস্থ বোধ কচ্ছি।'

মুরলীবাবু সাগ্রহ দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া উৎসুক কণ্ঠে বলিলেন —'ঠিক করেছো এরি মধ্যে? বেশ তো, এই জন্যেই সংসারের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি আমি। কোথায় ঠিক করলে বল?'

সরোজিনী বলিলেন—'রাজা বিনয়েন্দ্র মাসখানেক হোল এখানে ফিরেছেন শুনেছ তো?'

মুরলীবাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন—'তাতো শুনেছি। কিন্তু তাতে আমাদের কি সুবিধা হবে?'

সরোজিনী বলিলেন—'তিনি এতদিন সারা য়ুরোপ আর ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর পছন্দ মত মেয়ে খুঁজে। কিন্তু পাননি। তাই আজও তিনি বিয়ে করেন নি। এদিকে বুড়ো রাণী এতদিন আশায় ছিলেন এবার ছেলে বৌ নিয়ে ফিরবে, কিন্তু একা ফেরাতে তিনি নাকি অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কাল মিসেস মিত্র এসেছিলেন, ওরই মুখে সব শুনলুম। বুড়োরাণী মিসেস মিত্রকে খুব ভাল বাসেন কিনা তাই ওর কাছে কত দুঃখ করেছেন। মিসেস মিত্র তো রাজার অনেক নিন্দা করলেন, বল্লেন— ভারী আত্মসুখী রাজাটা, নইলে মার মুখ চেয়ে পছন্দটা কি একটু কম করা যায় না? সীমাকে দেখে ওঁর তো খুবই পছন্দ হয়েছে।'

মুরলী বাবু বলিলেন—'তাতো হয়েছে। কিন্তু যাঁর সমস্ত পৃথিবী ঘুরেও মেয়ে পছন্দ হয়নি তাঁর সীমাকে পছন্দ হবে বলে আশা কর?'

একটু বিরক্তভাবে সরোজিনী বলিলেন—'চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। আর সীমার মত সুন্দরী সহজে যে নজরে পড়ে না এটাও ঠিক।'

মুরলী বাবু বলিলেন—'তাতো ঠিক। কিন্তু এত বড় আশা করে, উপযাচক হয়ে আমরা কথাটা তুললে, রাজা যদি না পছন্দ করেন তো লোকে আমাদের উপহাস করে হাসবে যে।' সরোজিনী বলিলেন—'আমরা কেন প্রথমে বোলবো? পছন্দ হোলে ওরাই বলবে।'

মুরলী বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন—'কিন্তু সীমাকে তো দেখান চাই! শুধু শুধু ওদের বাড়ী সীমা গেলে লোকে কি ভাববে!'

বেশ মাতব্বরি ধরণের হাসিয়া সরোজিনী বলিলেন—'সবই ভেবেছি গো। আমরা কেন যাব? ওরাই আসবে আমাদের বাড়ী শুধু শুধু তো আনা হয় না, তাই এবার অনুর জন্মদিনের ভোজটা বেশ বড় করে আয়োজন করবো। এখানকার সব বড় বড় ঘরেই নিমন্ত্রণ করবো। তার আগেই মিসেস্ মিত্র বুড়ো রাণীকে বলে রাখবেন সীমার কথা। সুন্দরী মেয়ে আছে শুনলে রাণী নিশ্চয় আসবে ছেলেকে নিয়ে. পছন্দ হয় ভাল, না হয় আরো পাঁচ জন তো আসবে। তাদের মুখে সীমার রূপের কথা প্রচার হলে, অনেক পাত্র পাবার সুযোগ আসবে।'

মুরলী বাবু এইবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—'বাঃ এ চমৎকার মতলব। এই জন্যেই তো তোমার বুদ্ধির এত প্রশংসা করি। সাতবছর ধরে বসে ভাবলেও এ সব আমার মাথায় আসতো না।'

সরোজিনী বলিলেন—'কিন্তু খরচ এতে খুব হবে। সব বাড়ী বলা তাঁদের যোগ্য যোগাড় চাই তো। তা সীমার বাবা তো টাকা অনেক রেখে গেছে ওরই একটা ভাল পাত্র পাবার জন্যে, তাই আর খরচের কথা ভাবলুম না; তা যোগাড় আমার প্রায় সবই হয়েছে শুধু বাড়ী বাড়ী বলাটা বাকী। কাল মিসেস মিত্রকে আসতে বলেছি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ

করে সেটা ঠিক করে নেব।' কথা কটি শেষ করিয়া সরোজিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—'দেখ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখনও সীমা অনুকে নিয়ে ফিরলো না। তুমি কেবল বলো—সীমার মন খারাপ একটু বেড়ালে ভাল থাকবে। তাই কিছু বলি না। কিন্তু যতই সাহেবী আনা চালে চলি, ও বয়সের মেয়েদের একা একা বেড়ানটা আমি পছন্দ করি না: বিশেষ করে সীমার মতো সুন্দরী মেয়েদের, যারা চট করে লোকের নজরে পড়তে পারে। সংসারে কত রকম লোক আছে, ওরা তো এখনও সে সব জানে না, তাই সর্ব্বদাই ওদের সামনে রাখতে হয়।'

মুরলী বাবু উদ্বিগ্নভাবে বাহিরে চাহিয়া বলিলেন—'অন্য দিন তো এত দেরী করে না।'

ঠিক সেই সময় সীমা অনুর হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিল। অনুর মুখে-চোখে যেন আনন্দ আর ধরিতেছিল না। সে উচ্ছল কণ্ঠ-স্বরকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া মুরলী বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—'বাবা! মহারাজা দলমীর একজন লোক পাঠিয়েছেন তোমার কাছে, একখানা চিঠি দিতে। সেই লোকটির সঙ্গে আমাদের দেখা হোল সমুদ্রের ধারে। খুব ভাল লোক বাবা! মোটেই মহারাজের মতো খারাপ নয়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে একটুও বিরক্ত হন না। কাল তোমার কাছে আসবেন চিঠি নিয়ে।'

বিশ বৎসর ধরিয়া প্রত্যাশায় থাকিলেও অনভ্যাসে মুরলী বাবু যেন ইহার সম্ভাবনাও ভুলিয়া ছিলেন। তাই সীমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—'কি ব্যাপার মা?'

সীমা ধীরে ধীরে সকল কথা বলিতে লাগিল—সরোজিনী অনুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—'লোকটার বয়স কত রে?' অনু গম্ভীরভাবে বলিল—'কুড়ি কি চল্লিশ হবে। খুব সুন্দর দেখতে'। সরোজিনী বিরক্তভাবে বলিলেন—'তুমি বড়ো কথা বলো অনু! পথে-ঘাটে যার তার সঙ্গে কথা বলো কেন? ওই জন্যই তো তোমায় কোথাও যেতে দিতুম না। সীমা! এ সব বিষয় তোমার একটু বুদ্ধি থাকা উচিত।'

মুরলী বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—'যাও মা তোমরা কাপড় ছাড় গে।'

সীমা অনুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলে সরোজিনী বিরক্তভাবে বলিলেন—'দেখলে তো এই জন্যেই বলি। কে এই ছোঁড়াটা ঠিক নেই, এলো মেয়ে আলাপ করে। মহারাজ নিজে তো যে প্রকৃতির, কেমন লোক পাঠিয়েছেন কে জানে।'

মুরলী বাবু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—'ছি, ছি, চুপ করো। আমাদের মুখে ওসব কথা বেরুনো ভাল নয়। মহারাজের কাণে গেলে মুস্কিল হবে। তিনি যাকেই পাঠান তাকেই আমাদের সমাদর কর্ত্তে হবে, না হলে মহারাজকে অপমান করা হবে।'

সরোজিনী বলিলেন—'যত জ্বালা এক সঙ্গে বাপু। এখন তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বিদেয় কর্ত্তে পারলেই বাঁচি। একে নিজের শরীর নিয়ে মরি, তার উপর এত বড় একটা কাজের হেঙ্গাম, প্রাণটা এবার বেরুবে আর কি।'

মুরলী বাবু বলিলেন—'তুমি নিজে না খেটে, সীমাকে দিয়ে বলিয়ে ঝি-চাকরগুলোকে দিয়ে সব করিয়ে নাও।'

সরোজিনী বিরক্তভাবে বলিলেন—'হ্যাঁ ওরাই করবে এই কাজ, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি।'

৭

হিরণ দলমীরে আসিবার দুইদিন পরে। আসন্ন অপরাহ্নে মহারাজ দলমীরের সুবৃহৎ লাইব্রেরীর খোলা দরজাটীর সম্মুখে সীমা অনুর হাত ধরিয়া নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি মাত্র খোলা দরজার স্তিমিত আলোয় বহুদিনের অব্যবহার্য্য আসবাব-পত্রের অমানুষিক গন্ধে, বহুদিনের বন্ধ বাতাসের সহিত সদ্য পরিষ্কারের মৃদু গন্ধ মিশিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছিল যেন কোন অবাস্তব লোকের আভাষ।

সীমার দৃষ্টি সেই স্বল্প আলোয় অভ্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতেই দেখিতে পাইল একপাশে একটি ছোট টেবিলের ধারে একখানি নীচু চেয়ারে বসিয়া হিরণ। সম্মুখের টেবিলের উপর একখানি বই রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া একখানি হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে পড়িতেছে। তাহার বসিবার অসতর্ক ভঙ্গীতে, শুভ্র মসৃণ ললাটের চিন্তা-চিহ্নে, মুখের জ্ঞানগম্ভীর রেখায় এমন আত্মসমাহিত শান্ত তন্ময়তা ফুটিয়াছিল যাহার মাধুর্য্য সীমাকে বিস্মিত, নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। সে পরম-বিস্ময়ে ভাবিল, এই কি সেই হাস্যচঞ্চল কৌতুকপ্রিয় হিরণ! এই লোকটীই কি কাল ঠিক এমনি সময়ে অনুর সহিত বাজী রাখিয়া সুদীর্ঘ ফুলের গাছটীর সর্ব্বোচ্চ শাখা হইতে লঘু ক্ষিপ্রগতিতে ফুল পাড়িয়া বালকের মত উচ্ছল আনন্দে হাসিয়াছিল?

হিরণের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর সীমার আরও অনেকখানি সময় কাটিয়াছিল তাহার উপস্থিতির মধ্যে। হিরণের সুমার্জ্জিত শিষ্টাচার, সুমিষ্ট পরিহাস তাহাকে সব সময়ই আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার আজিকার এই নিবিড় নিবিষ্টতার গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যের সহিত ছিল সীমার আপনার অন্তরের, আর পিতার আদর্শের সামঞ্জস্য, তাই এই ধ্যান-গম্ভীর মুর্ত্তি তাহার মনে আনিয়া দিল একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত মুগ্ধতা।

সে নির্ব্বাক্ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনুর কল-হাস্য হিরণকে সচকিত করিয়া তুলিল। সে শশব্যস্তে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—'আরে, আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন। আমার বেলার খেয়াল নাই পড়তে পড়তে। বইটা এমন সুন্দর আর ঘরটাও অন্ধকার কিনা। বসবেন একটু, না এখনি চলবেন ?'

অনু জিজ্ঞাসা করিল—'কি বই ওটা ? ভাল ভাল ছবি আছে বুঝি ? হিরণ বলিল—'না ভাই, ওটা ছবির বই নয়, এখানে খুব ভাল ভাল ছবির বই আছে দেখবে তুমি ?'

অনু লুব্ধদৃষ্টিতে সীমার দিকে চাহিয়া বলিল—'দিদি, ভাই কি হবে রোজ এক জায়গায় বেড়িয়ে ; আজ তার চেয়ে এখানে বসে ছবি দেখাই ভাল, কি বলো ?'

সীমা হাসি মুখে সম্মতি দিলে হিরণকে দুহাতে জড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে অনু বলিল—'কই দেখান ?'

সীমা বলিল—'তার আগে তুমি শান্ত হয়ে বোসো অনু।' অনু সামনেই একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। হিরণ ঘরের একটি বইয়ের আলমারী খুলিয়া বই বাছিতে লাগিল। সীমা ধীরে ধীরে

হিরণের পরিত্যক্ত টেবিলের নিকট আসিয়া হিরণের পঠিত পুস্তকখানি তুলিয়া লইয়া দেখিল সেখানি একজন ইংরাজের লেখা হিন্দু দর্শন। এই দর্শন শাস্ত্রে সীমার পিতার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি সারাজীবন গভীর অধ্যবসায়ের সহিত ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাই সীমার নিজের এবিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকিলেও পিতৃপরায়ণতার জন্য ইহার প্রতি প্রীতি ছিল তাহার জন্মগত। জ্ঞানাবধি ইহাকে সে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। সাধারণের অবজ্ঞাত এই অবাস্তব বিষয়টী হিরণের মনকে এমন তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছিল, ও এই মাত্র সে ইহাকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিল জানিয়া সীমার মন তাহার বর্ত্তমান একমাত্র অসমপ্রকৃতি আত্মীয়দের অপেক্ষা এই অপরিচিত যুবকের প্রতি আত্মীয়তা অনুভব করিল অধিক। সে বইখানি রাখিয়া দিয়া সেই-খানেই যে সুদৃশ্য বাঁধান খাতাখানি পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিল পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কয়েকটী কবিতা লেখা। তাহার একটি পড়িবার উপক্রম করিতেই হিরণ আসিয়া বলিল, 'ওখানিও আপনার হাতে পড়লো। ওর লেখা আপনি পড়তে পারবেন না। যদি শুনতে চান তো আমি পড়ে শোনাতে পারি।' সীমা বলিল—'আপনি কবিতা লেখেন?'

হিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—'কি আর করি; পেটের তাগাদায় ওই আমায় কত্তে হয়। আর কিছু করবার শক্তি নেই তো। ওই কবিতারি খোরাক যোটাতে এদিকে ওদিকে ছুট্‌তে হয় আমাকে।'

সীমা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?'

হিরণ বলিল—'এই পাঁচরকম পড়াশোনা দেখাশোনা দরকার হয় কিনা, যেমন এখানে এসেছি।' সীমা বলিল—'কিন্তু পড়ছিলেন তো ফিলজফি।'

হিরণ উত্তর দিল—'হ্যাঁ, ওরও মাঝে মাঝে দরকার হয় বৈকি? তা ছাড়া ওটা আমার খুব প্রিয় জিনিষ। আজও আমাদের সমস্ত পৃথিবীর কাছে গর্ব্ব করবার মত ওই একটি জিনিসই আছে।'

সীমা বলিল—'বাবাও অই কথা বলতেন। ও বিষয়ের তাঁর বই ছিল অনেক। সবটুকু অবসর তিনি কাটাতেন সেগুলি পড়ে আর তারি বিষয় আলোচনা করে।'

হিরণ হাসিয়া বলিল—'ওঃ তিনিও তা' হ'লে আমারি মত অসংসারী বেহিসেবী ছিলেন বলুন। কেননা আজকাল যাঁরা খুব বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, তাঁদের মত হচ্ছে—মানুষের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন বাঁচবার। তাই তাকেই সাহায্য কত্তে পারে এমন কিছুর চর্চ্চা করাই হচ্ছে বর্ত্তমান মানুষের কর্ত্তব্য। তাই আর্থিক উন্নতির জন্য ইকনমিক্স আর দৈহিক ও মানসিক উন্নতি জন্যে সাইকোলজির চর্চ্চাই আজকাল চলেছে বেশী। আজকাল ফিলজফিটাকে অনেকে অনাবশ্যক চিন্তার বিলাস বলে অবজ্ঞা করেন। অনেক সময় তাই এটা এত ভাল লাগাকে আমার অপরাধ বলে মনে হয়েছে। আজ আপনার মুখে আপনার বাবার কথা শুনে ভারী ভালো লাগলো আমার। এ যুগেও তা হ'লে এমন লোক আছেন কেবল-মাত্র ভাল লাগার জন্যেই যাঁরা পড়া শোনা করেন।'

সীমা মৃদু বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'আমার বাবা ছিলেন সংসারের সমস্ত লোকের চেয়ে আলাদা। অবিশ্যি আমার সংসারের বেশী অভিজ্ঞতা নেই। তবুও যাদের আমি দেখেছি আর দেখছি তাদের মত তিনি ছিলেন না। কোনও মানুষকে, কোনও মতকে কোনও ধর্ম্মকে, তিনি অবজ্ঞা কত্তেন না। বলতেন—আমার যা ভাল লাগে বা আমার সংস্কার

যা আমাকে বলায় তাই সত্যকারের ভাল বা উপকারী এ কথা কোন লোক কোন ধর্ম্মে বলতে পারে না। তাই ধর্ম্ম নিয়ে বা সংস্কার নিয়ে কোনও মানুষকে অবজ্ঞা করাটাকে তিনি বলতেন মনের একচোখোমী।'

হিরণ বলিল—'আশ্চর্য্য মিল কিন্তু আমার মতের সঙ্গে। ভারী হিংসে হচ্ছে আমার আপনার ওপর। এমন লোকের পায়ের তলায় বসে যদি কিছু শিখতে পারতুম।'

সীমা ম্লান হাসির সঙ্গে উত্তর দিল—'আমি কিন্তু কিছুই শিখতে পারি নি। বাবা বলতেন সংসারকে মায়ায় বেঁধে রাখাই যাদের কাজ মা, তাদের নিজের মনকে খুব মুক্ত করে ফেললে চলবে কেন।'

হিরণ ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে বাহিরে চাহিয়া আছে দেখিয়া সীমা চুপ করিল। হিরণ খাতাখানি হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল, সীমা বলিল—'কই পড়লেন না তো।' হিরণ দৃষ্টি ফিরাইয়া সীমার দিকে চাহিয়া বলিল—'আজ যে অন্ধকার হয়ে গেল। কাল শুনবেন।'

সীমার এতক্ষণে খেয়াল হইল সত্যই অপরাহ্নের আলোটুকু অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সীমা ঈষৎ লজ্জিত হইল।

এখানে আসিয়া অবধি এখানকার বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে আপনার মনকে সে নিভৃতে নির্ব্বাসিত করিয়া ইহাদের মতামত গুলাকেই মানিয়া চলিত নিরাপত্তে।

অপরকে সহ্য করিবার শিক্ষাই সে পাইয়াছিল পিতার নিকট। নিজের সংযত বাক্ ও শান্ত প্রকৃতি তাহাকে প্রতিক্ষণই সাহায্য করিত এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিঃশব্দে বাস করিতে। কিন্তু আজ অকস্মাৎ হিরণের নিকট হইতে তাহার নিঃশেষিত অতীতের ঈষৎ

আভাষ তাহাকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। নিজের এই অসতর্কতার অপরাধ তাহাকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। সম্মুখের খোলা দরজার কাছেই অনু বসিয়া ছিল, তাহার দিকে চলিতে চলিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল—'চলুন তাহ'লে আজ বাড়ী যাই।' হিরণ নিরুত্তরে সঙ্গে চলিল।

৮

ভোজের দিন ভোর হইতেই সরোজিনী সকলকে অকারণ বকিয়া নিজে বিরক্ত হইয়া ও লোকজনের প্রাণ অস্থির করিয়া বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ উপরে আসিলেন।

একটু পর হইতেই নিমন্ত্রিতের দল আসিতে আরম্ভ করিবে তাই সীমার সজ্জাটা এখনই শেষ করিতে তাহাকে ডাকিলেন।

সীমার বয়সে সব মেয়েরাই প্রায় একটু সাজসজ্জা করিয়া আপনাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু এই কয়দিন সীমার মধ্যে তাহার কোন লক্ষণই না দেখিয়া আজ নিজেই তাহাকে সাজাইয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন।

এই কয় দিনেই সরোজিনী বুঝিয়াছিলেন এই মেয়েটি ঠিক তাহার বাপের মতই বেহিসেবী। ইহার সংসারের কোনও কিছুতেই যেন আসিয়া যায় না ভাবটা তাই তাহাকে বেশ একটু শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া হিরণ আসিবার পর হইতে এই ভয়টা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই ছেলেটীর অনাহূত আলাপ করিবার ক্ষমতা ছিল এত বেশী যে, এই কয়দিনেই সে এই পরিবারে অতি পরিচিতের আসনখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

ইহাতে সরোজিনীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও কিছুই বলিতে

পারিতেন না দুটী কারণে—প্রথম হিরণ মহারাজ দলমীরের অতিথি, দ্বিতীয় তাহাদের কোন পর্দ্দার প্রথা ছিল না। বলিতে গেলে এখানে কোনও পরিবারেই এই প্রথা ছিল না। এ দেশের বাসিন্দাদের পর্দ্দার প্রথা নাই। আর যাঁহারা প্রবাসী বাঙ্গালী তাঁহারাও বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার ব্যারিষ্টার রাজ-কর্ম্মচারী বা রাজা কিম্বা জমীদার। ইহারা সকলেই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। সরোজিনী এই সব সুশিক্ষিত ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে মেলামেশা করিতে খুব গর্ব্ব বোধ করিতেন। তাই বাল্যকালে সুদূর বাংলার যে নিয়ম কানুনগুলা মানিয়া চলিতেন এখানে আসিয়া সে গুলি ত্যাগ করিয়া এই সমাজের উপযোগী আচারে অভ্যাসে আপনাকে যথাসাধ্য যত্নে গড়িয়া ছিলেন।

একদিন অনেক চেষ্টায় যে প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন আজ তাহারি আবরণ দিয়া এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী যুবকটীকে আড়াল করিতে না পারিয়া নিরুপায় ক্রোধটা ঘুরিয়া ফিরিয়া হিরণকেই আশ্রয় করিতে চাহিত। কিন্তু এই বিনয়ী ছেলেটীর ব্যবহার এমন সুষ্ঠু ও মার্জ্জিত যে প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও পাইতেছিলেন না।

এই কয় দিনের মেলা মেশায় হিরণের প্রতি সীমার অনবধান মনের ঈষৎ মুগ্ধ আকৃষ্টতাও তাঁহার অগোচর ছিল না। তাই আজ সীমাকে সাজাইবার কথা স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যায় হিরণেরও উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়া সরোজিনীর মন আরো বিরক্ত হইয়া উঠিল। অথচ তাঁহারই বাড়ীর উৎসবে মহারাজের অতিথিকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই বা উপায় ছিল কি।

সীমা আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বেশ বিরক্তস্বরে বলিলেন—'কোথায়

ছিলে এতক্ষণ। চুলটাও তো বাঁধনি এখন। লোকজন তো এখনি আসতে আরম্ভ করবে।'

সীমা মুখ নীচু করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—'অনুকে তার নতুন পোষাকটা পরিয়ে দিচ্ছিলুম। আমি এখনই চুল ঠিক করে নিচ্ছি।'

সরোজিনী বলিলেন—'শীগগীর করে ঠিক করো। না পারোতো আমার কাছে এসো। আর তোমার সব চেয়ে ভাল যে শাড়ীটা আছে সেটা নিয়ে এসো দেখি মানাবে কিনা।'

সীমা চলিয়া গেল; একটু পরে একখানি জরি পাড় সাদা শাড়ী আনিয়া সরোজিনীর নিকট রাখিতেই তিনি একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'কেমন তুমি বলতো; এই ঠাকুমার মতো সাদা শাড়ীটা আনলে কোন আক্কেলে শুনি?'

সীমা অপরাধীর মতো মৃদু কণ্ঠে বলিল—'কোনও রঙীন শাড়ীতো আমার নেই। বাবা সাদাই পছন্দ করতেন।'

সরোজিনী তেমনি সুরেই বলিলেন—'বেশ করতেন। এখন যাও বড় আলমারীটা খুলে একখানা নীল রংয়ের বেনারসী আর ব্লাউজ আছে নিয়ে এসো, চুলও তো চমৎকার বেঁধেছ, সবই আমার করে দিতে হবে আর কি! তোমার বাবা যা তোমার পছন্দ তৈরী করে দিয়ে গ্যাছেন সে তো কোনও ভদ্র সমাজে চলবে না।'

সীমা ম্লান ছল ছল চক্ষে চাবী লইয়া চলিয়া গেল।

৯

সন্ধ্যায় উজ্জ্বল দীপালোকে দিবালোকের ন্যায় দীপ্ত মুরলীবাবুর সুসজ্জিত ঘরখানি সুবেশ অতিথিদের হাস্যালাপে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সমাগতা সম্ভ্রান্ত সুন্দরীদের মধ্যে সরোজিনীর নিপুণ হাতের প্রসাধনে সীমা কেশে বেশে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতেছিল। সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে ঘিরিয়াছিল।

সরোজিনী বেশ গর্ব্বের সহিত সীমাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছিলেন।

সন্ধ্যার একটু পরেই সপুত্র রাণী আসিলেন। সমস্ত ঘর-ভরা অতিথিদের সহিত মুরলী বাবু উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। মাতাপুত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া তিনি ইহাদের পদার্পণে আপনার সৌভাগ্যের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সীমাকে আনিয়া রাণীর পরিচয় দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। সীমা নত হইয়া প্রণাম করিতেই রাণী তাহাকে আপনার নিকট টানিয়া আনিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'একে কোথায় পেলি মা! একি রূপ!' রাণী সীমাকে দেখিতেই আসিয়াছিলেন। তাহার মানবীদুর্লভ রূপ দেখিয়া সাগ্রহে পুত্রের দিকে চাহিয়া রাজার মুগ্ধ বিস্ময়ের আত্ম-ভোলা দৃষ্টি দেখিয়াই পুত্রের অন্তর বুঝিতে পারিলেন, সীমাকে আরো কাছে টানিয়া বলিলেন—এতদিন যে একেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এরই মুখে মা ডাক শুনবো বলে আজও যে

মরিনি। কেমন মা, এই বুড়ীকে মা বলবি তো······রাণীর এই সব স্নেহের অভিব্যক্তি সীমার মনে কেমন একটা অবসাদ আনিতেছিল। ইহাকে গ্রহণ করিতে কোথায় যেন তাহার বাধিতেছিল। এই অপরিচিত সমাগতদের সমালোচনার মধ্যে এই নতুন স্নেহের আমন্ত্রণ যেন তাহাকে অকারণ আঘাত দিতেছিল। এই আবেষ্টনের মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য তাহার সমস্ত মন যেন আকুল হইয়া উঠিল। রাণী বাহুবেষ্টনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

বাহিরে সিঁড়ির উপর বারান্দায় অনু চঞ্চল চরণে বেড়াইতেছিল। সীমাকে দেখিয়াই নিকটে আসিয়া বলিল—'দিদি দেখলে হিরণদার কাণ্ডটা। সবাই এসে গ্যাল আর ওঁর দেখা নেই। বেশ না এলেন। এবার তুমি দেখ দিদি কিছুতেই আমি আর কথা বলছি না। তা যতই ফুল পেড়ে দিন আর গল্প বলুন, কিছুতেই ভুলবোনা আমি।'

সীমার মনও হয় তো তাহার অনুভূতির অজ্ঞাতে এই অভিযোগই এতক্ষণ তাহাকেও জানাইতেছিল। এখন অনুর নাড়া পাইয়া সে ও প্রকাশ্যে সাড়া দিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু সীমার জাগ্রত বোধ তাহাকে অস্বীকার করিল। সে যেন শুধু অনুকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিল—'তার ওপর আমাদের কি'ই বা দাবী অনু! নাই যদি আসেন। বিদেশী তিনি, কালই যদি এখান থেকে চলে যান কোনও সম্পর্কই তো থাকবে না।'

এ সান্ত্বনায় অনু তো শান্ত হইলই না, সীমার অন্তরের সদ্য অনুভূত অথচ অস্বীকৃত অভিমানের প্রচ্ছন্ন বেদনাটুকুই কি মিলাইয়া গেল?

সীমা আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। রাণী আবার তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তেমনি আদরে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

সরোজিনী রাণীর কথায় আর রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিতে আপনার সাফল্যের সন্ধান পাইয়া সীমার সৌভাগ্যে সুনিশ্চিত হইলেন। তাঁহার চলায় বলায় যেন আনন্দ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

স্বল্পবাক্ রাজা একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন সীমার রূপসাগরে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল। এমন সময় হিরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া মুরলী বাবু হিরণের পরিচয় দিলেন। হিরণ মহারাজ দল-মীরের নিকট হইতে আসিয়াছে শুনিয়া সকলেই তাহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া পড়িল।

হিরণ তাহার আলাপের সুমার্জ্জিত শিষ্ট অসঙ্কোচ ভঙ্গীতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল।

রাজা শুধু দূরে বসিয়া হিরণের অনাবশ্যক সুন্দর রূপ, অল্পক্ষণের মধ্যে পরিচিত হইবার সহজ শিক্ষা দেখিয়া কেমন একটা অকারণ বিদ্বেষ বোধ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই তিনি মুরলী বাবুর নিকট বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীও উঠিয়া সীমার হাত ধরিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহাদের বিদায় অভিবাদন জানাইতে নিকটে আসিতে লাগিলেন। হিরণ সেই দিকে চাহিতেই প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সুসজ্জিতা সীমার উপর। অল্পক্ষণ মাত্র তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি সীমার মুখের পরে স্থির হইয়া রহিল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হিরণের এই নিমিষের দৃষ্টিটুকুই সীমার মন হইতে আজিকার প্রসাধনের সমস্ত গ্লানিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া একটা মধুর আনন্দের তৃপ্তিতে ভরিয়া দিল।

রাজা বিনয়েন্দ্রের চক্ষে, হিরণের উজ্জ্বল মুগ্ধ দৃষ্টি আর এতক্ষণের বিষণ্ণ সীমার মুখের পর আনন্দের দীপ্তিটুকু গোপন রহিল না।

তাঁহার মর্য্যাদাশীল মন সামান্য লোকটার স্পর্দ্ধায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সীমার মুখের সেই আনন্দের দীপ্তিটুকু তাঁহাকে বেদনা দিল।

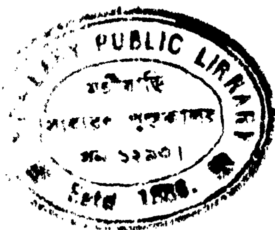
অন্বেষণী মনের এতদিনের সন্ধান এই সামান্য লোকটার কাছে পরাজয়ের বেদনায় পর্য্যবসিত হইবে নাকি? না, না, তাহা হইতে পারে না, চিরদিন মন যাহা চাহিয়াছে তাহা না লইয়া ফিরে নাই, আজও সে ফিরিবে না।

রাজার গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইল। পরিচিতদের নিকট বিদায় লইয়া মাতার সহিত তিনি বাহির হইয়া গেলেন। রাণী বার বার বলিলেন— উপায় থাকিলে তিনি আজই সীমাকে লইয়া যাইতেন। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহারা যোগ্য সম্মানে সীমাকে আপন করিয়া লইবেন। রাণীর কথায় কৃতার্থ হইয়া সরোজিনী তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলেন।

সীমার অন্তর যেন আকুল হইয়া পড়িল। সে হিরণের স্বচ্ছ ভাষাময় দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া এমন কিছু দেখিতে চাহিল যাহাতে তাহার সকল সমস্যার শেষ হইয়া যায়।

হিরণ তখন তাহার নবপরিচিত মহিলাদের সহিত গভীর মনোযোগের সহিত গল্প করিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার সুমিষ্ট হাসি সকলকেই মুগ্ধ করিতেছিল।

সীমা নিঃশব্দে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। হিরণ একটিবার তাহার দিকে চাহিয়াই আবার গল্পে নিবিষ্ট হইল। সেই আনন্দ-চঞ্চল চক্ষের দৃষ্টিতে সীমা কি দেখিল কে জানে। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল।



১০

সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিতেই সীমাকে সরোজিনী বেশ বিরক্তভাবে বলিলেন—'কেমন মেয়ে তুমি বাছা! একদিন তো তোমার না বেড়ালে চলে না, অনুটাকে শুদ্ধু খারাপ করে ফেল্‌ছো। রাজা বাহাদুরের বাড়ী যে আজ যেতে হবে, কখন যাবে তাতো জানি না।'

সীমা অপ্রস্তুতভাবে বলিল—'মনে ছিল না, এখনই আমি ঠিক হয়ে নিচ্ছি।'

অল্প পরে সীমা প্রস্তুত হইয়া আসিলে সরোজিনী ও মুরলীবাবু তাহাকে লইয়া রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন।

রাজবাড়ীতে আজিকার উৎসবের আয়োজনটী সীমাকে উপলক্ষ করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা সীমাকে মনোনীত করিয়াছেন, সত্বরই তাহাকে রাণীর সম্মানে বরণ করিবেন, এই সংবাদটী সকলকে জানাইবার জন্য রাণীমা এই আয়োজনটী করিয়াছিলেন।

সীমা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইতেই বুড়োরাণী তাহাকে লইয়া তাহার ভাবী রাণীগিরির সকল সম্পদ্‌ দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন। প্রতিক্ষণেই রাণীর অজস্র আদরে সীমা যেন বিপন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

রাজা বিনয়েন্দ্র সীমার সহিত আপনার রূপ ও বয়সের অসামঞ্জস্য

যেন আজ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ঢাকিয়া ফেলিবার ইচ্ছায় এই উৎসবকে রাজসিক সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহার বিপুলতায় হিরণকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া নগণ্য করিয়া দিবার কল্পনায় ঈর্ষা পুলকিত মনে তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেম।

অসম্ভব প্রাচুর্য্যের মধ্যে আহার সম্পন্ন হইলে রাজা সকলকে লইয়া নানা বর্ণের মৃদু আলোকে মায়ালোকের মত মনোহর সুরভি স্নিগ্ধ একখানি ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম প্রবেশ করিয়াই সকলে গন্ধে বর্ণে আর পুষ্পের পরিপাটী বিন্যাসের চারুতায় মুগ্ধ হইয়া গেল।

সদা-প্রফুল্ল সপ্রতিভ হিরণ, একপাশে অবস্থিত অর্গানটীর সম্মুখে বসিয়া বলিল—'এমন স্বপ্নের মত সুন্দর ঘরে বসে একটু একটু সুর নিশ্চয় সকলকে আনন্দ দেবে।' কথাটী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুশিক্ষিত আঙ্গুলগুলির স্পর্শ পাইয়া অর্গানের বুক হইতে অতি মৃদু আবেশময় সুর বাহির হইতে লাগিল। সকলেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল 'বাঃ বাঃ চমৎকার! রাজা বাহাদুর এইবার আপনার আয়োজন সম্পূর্ণ সুন্দর হোল। এমন ঘরে বসে এমনি একটি সুরের মধ্যে আত্ম-বিস্মৃত হতেই ভাল লাগে।'

মহিলারা যন্ত্রের সহিত কণ্ঠের মিলন করিতে হিরণকে অনুরোধ করিলেন। হিরণ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে একটু'ও বিলম্ব করিল না। বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার মধুর কণ্ঠের ভাব-কোমল সুর উঠিয়া নামিয়া কোন অন্তর-লোক-বাসিনীর প্রতি আকুলতার নিবেদন জানাইয়া থামিয়া গেল। সঙ্গীতের সুললিত ভাষা সেই আবেদনের আকুলতা বহিয়া যেন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে কিছুক্ষণের জন্য

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যেন গায়কের অন্তরের কোনও প্রচ্ছন্ন ব্যথার স্পর্শ সকলের মনের উপর দিয়া বহিয়া থামিয়া গেল।

কেবল এই সুরকে সকলের উচ্ছসিত প্রশংসায় শেষ হইতে দেখিয়া রাজা বাহাদুরের অন্তর অনুতাপে ভরিয়া গেল কেন এই হতভাগ্যটাকে এই সম্মানের সুযোগ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ভাবিয়া।

তিনি বার বার সীমার দিকে চাহিতে লাগিলেন তাহার মুখ দেখিবার জন্য। রাজা বাহাদুর জানিতেন সহজ কণ্ঠের সহস্র কথায় যে করুণতার আবেদন মানুষের মনে এতটুকুও স্থান পায় না, সুরের মাধুর্য্য মাখিয়া তাহার একটিমাত্র কথাই প্রাণে আকুলতার উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। শ্রোতা ভুলিয়া যায় অতীত ভবিষ্যত, ভাল-মন্দের বিচার, সে নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করিয়া দিতে চায় সুর-বিহ্বলতার মাদকতায়।

তাই শঙ্কাতুর রাজা বার বার সীমাকে দেখিতে লাগিলেন। হিরণের উদ্দিষ্টাকে চিনিতে না পারিবার মত বুদ্ধিহীনতা তাঁহার ছিল না।

কিন্তু সীমা তখন একটি খোলা জানলার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া ছিল।

আজিকার এই উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝিয়াই তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কেমন করিয়া এই অবাঞ্ছিত সৌভাগ্যকে সে ঠেকাইয়া রাখিবে, আর কেনই বা কিসের বাঞ্ছায় সে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাই একটা অকারণ অশ্রু তাহার অন্তর উদ্বেল করিতে চাহিতেছিল। হিরণের সঙ্গীতে সেই অশ্রু অ-সম্বরণের আশঙ্কায় সে

উঠিয়া বাহিরে চাহিয়া ছিল। সঙ্গীত থামিয়া গেলে ধীরে ধীরে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল।

নীচে রাজার সযত্ন-সজ্জিত পুষ্পোদ্যান শুভ্র চন্দ্রকিরণে স্নান করিতেছিল। সীমা অন্য মনে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ পাশে রাজার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—রাজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 'চলুন না নীচে নেমে গিয়েই বাগানটা দেখবেন, ওখানে বসবারও বেশ জায়গা আছে।'

রাজার স্বর যেন ঈষৎ কম্পিত। সীমা চাহিয়া দেখিল তাঁহার চোখে যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি জ্বলিতেছে।

সে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—'না, না, আমি এখানেই বেশ আছি।'

রাজা বলিলেন—'আপনি গেলে আমি খুব সুখী হতুম, এখনি চলে আসবেন, খুব কষ্ট হবে কি?'

রাজার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বর যেন মিনতি-কোমল হইয়া উঠিল। সীমা আর অস্বীকার করিতে পারিল না, রাজার সহিত ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।



১১

বাগানের নিভৃত একটি কোণে শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত একটি আসনে সীমাকে বসাইয়া রাজা তাহারই পাশে অল্প একটু দূরে বসিলেন।

চুপ করিয়া সীমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এই বংশ-গৌরবী রাজা জীবনে আজ প্রথম নিজের সংযত-বাক্ স্বভাবের জন্য দুঃখ অনুভব করিলেন। অধিক কথা বলা তাঁহার মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়া তিনি অনেক যত্নে বাক্যহীন গাম্ভীর্য্যকেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

আজ সেই চিরাভ্যস্ত নীরবতাই তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। অন্তরে অসংখ্য ভাব সমুদ্রের মত উত্তাল হইয়া উঠিতেছে; ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। ক্ষুব্ধ রাজার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল—হিরণের সুন্দর মুখের সুমিষ্ট স্বরে কথা বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী, অকুণ্ঠিত আলাপ।

অসহিষ্ণু রাজা সীমার দিকে আরও একটু সরিয়া বলিয়া উঠিলেন—'সীমা আমার এই সব ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ সব তোমার হাতে তুলে দিতে চাই, বলো সীমা এ সব তোমার কাছে তুচ্ছ নয়?'

সীমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'ও সব কেন আমায় বলছেন, আমি যেতে চাই এখন।'

রাজা উঠিয়া সীমার নিকটে আসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন—'আমি তোমায় যেতে দেব না সীমা! সারা পৃথিবী আমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে ঘুরে এসেছি, কারো হাতে তুলে দিতে পারি নি; তোমায় দেখা মাত্র আমার সকল কিছু তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। ভিক্ষা চাইছি শুধু তুমি নাও। দয়া করে আমার সব তোমার করে নাও সীমা।'

একটা উগ্র উত্তেজনায় রাজার স্বর কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে সীমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল। সে আবার সেই আসনেই বসিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া কোন মানুষের সাড়া না পাইয়া আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। রাজা আবার তাহার অত্যন্ত নিকটে বসিয়া অধৈর্য্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'উত্তর দাও সীমা! চুপ করে থেক না।'

সীমা অনেক চেষ্টায় উত্তর দিল—'আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার এ দানের যোগ্যা নই।'

সীমার কথা শুনিয়া রাজা অদ্ভুত স্বরে হাসিয়া উঠিলেন—তেমন হাসি সীমা কখনও কোনও প্রকৃতিস্থ লোকের মুখে শুনে নাই। রাজা সীমার হাত দুখানি ধরিয়া অধীর ভাবে নাড়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—'জানি! জানি! আমায় তুমি অবহেলায় ফিরিয়ে দেবে। ওই ভবঘুরে বুজরুক কবিটা তার অসাধারণ চাতুর্য্যে তোমার সমস্ত মন মুগ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু তুমি যে ওই পথের ভিক্ষুকের চেয়ে সম্বলহীন বাক্-সর্ব্বস্ব লোকটার জন্যে আমার সকল দান উপেক্ষায় ফেলে যাবে, এ আমি হতে দেব না।' সীমা আপনার হাত দুইটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে

করিতে বলিল—'আজ বোধ হয় আপনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। আমায় ছেড়ে দিন, আমি আপনার ওসব কথা শুনতে ইচ্ছা করি না।'

তাহার হাত দু'টি আরও জোরে ধরিয়া রাজা বলিলেন—'আমিও এখন তোমায় এখান থেকে যেতে দিতে ইচ্ছা করি না—যতক্ষণ তুমি আমার পত্নীত্ব স্বীকার না করবে ততক্ষণ এখান থেকে তোমার যাবার কোনও উপায় নাই।'

রাজার স্বরে এমন একটা দৃঢ় সত্যের উৎকট আভাষ ছিল যে সীমা তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ঠিক সেই সময়ে অল্প দূরে হিরণের সুমিষ্ট স্বর যেন তাহার অবসন্ন দেহে তাড়িত সঞ্চার করিল। সে চাহিয়া দেখিল—

অল্প দূরে অবারিত জ্যোৎস্নালোকে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যের সজীব প্রতিমূর্ত্তির মত হিরণ দাঁড়াইয়া হাসিমুখে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—'গৃহস্বামী অনুপস্থিত, অতিথি তাই বিদায় নিতে পারছে না।'

হিরণকে দেখিয়াই রাজা তাহার দিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া অসহ্য ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন—'অসভ্য ইতর কোথাকার, আমার অন্তঃপুরের বাগানে তুই কোন সাহসে এলি? পাজী বদমায়েস ছোটলোক, শীগ্‌গীর এখান থেকে চলে যা, না হলে তোকে আজ সহজে ছাড়বো না।'

শান্তভাবে রাজার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে হিরণ বলিল—'বুদ্ধি হারিয়ে ফেল না রাজা! তোমার বংশ-গৌরব স্মরণ রেখ।'

কাঁধের উপর হইতে হিরণের হাতটা সরাইয়া দিয়া একটু পিছাইয়া গিয়া রাজা এমন ভাবে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন জীবনের এই প্রথম ও পরম পরাজয়কারীকে দু'টী চোখের অগ্নি-বর্ষী-দৃষ্টি দিয়াই ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।

সীমা ধীরে ধীরে হিরণের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'দয়া করে আমায় জেঠা মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাবেন।'

হিরণ এতক্ষণ দুঃখিত দৃষ্টিতে এই দুর্ভাগা রাজাকে দেখিতেছিল। সীমার কথা শুনিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—'রাণীমার অনুরোধে আজ রাত্রে আপনাকে এখানে রেখে তাঁরা বাড়ী চলে গ্যাছেন।'

সীমা ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'সেকি, আমি একা এখানে কেমন করে থাকবো।'

সেই অসহায় আর্ত্তস্বর হিরণের সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিল। সে আশ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিল—'ভয় কি, যদি বলেন আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি।'

সীমা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল—'তা হ'লে খুব উপকৃত হবো আমি।'

সীমাকে লইয়া চলিতে চলিতে হিরণ শুনিতে পাইল রাজা বিকৃত-উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন—'মনে রাখিস্, জীবনের শেষ দিন অবধি এ অপমান আমি ভুলবো না। আজ থেকে তোকে ধ্বংস করাই হোল আমার একমাত্র কাজ।'

১২

বাড়া হইতে বাহির হইয়া খানিকটা পথ চলিয়া হিরণ সীমার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহাকে বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হইতেছে। সে একটু থামিয়া বলিল—'মিস রায়! আপনাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এখান থেকে বাড়ী এখনও বেশ দূর, রাতে এ ধারটায় গাড়ীও তো পাব না, ওই গাছটার তলায় বসে একটু বিশ্রাম করে নেবেন?'

সত্যই সীমা তখন এমন অবসন্নতা অনুভব করিতেছিল যে, প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় হইতেছিল বুঝি অশক্ত চরণ তাহাকে এই পথের পরেই শয়ন করাইয়া দিবে। তাই সে হিরণের প্রস্তাবে নীরবে সম্মতি জানাইল।

হিরণ একটি গাছের তলায় গিয়া শিশির-ভেজা ঘাসের উপর গায়ের কোটটী খুলিয়া পাতিয়া দিয়া বলিল—'সব ভিজে গ্যাছে এইটের উপর বসুন।'

সীমা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—'ওকি কোট-টা খারাপ হয়ে যাবে যে।'

হিরণ তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—'ভারী তো কোট—ওটা আপনার সাড়ীটার চেয়ে ঢের কম দামী, তা ছাড়া ওটা খুব পুরোনো দু' এক জায়গায় ছেঁড়া আছে, আলো থাক্‌লে আপনাকে দেখাতুম। বসে

পড়ুন, এই দেখুন রুমাল পেতে আমিও বসছি।' বেশী প্রতিবাদ করিবার শক্তি সীমার ছিল না, সে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

চারিদিক স্তব্ধ, নির্জ্জন। দু'পাশে বড় বড় গাছগুলি সুদীর্ঘ ছায়ায় নিদ্রিত পথটিকে আগলাইয়া পড়িয়া ছিল। আলো-ছায়ার আবছা মায়ায় অপরূপ সেই পথটীর পরে দৃষ্টি ফেলিয়া দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটা অপ্রাপ্তির ব্যথা সীমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিতে চাহিতেছিল, সীমা তার সমস্ত শক্তি দিয়া সম্ভ্রমবোধকে সজাগ করিতে চাহিতেছিল অবুঝ মনের কান্না থামাইবার জন্য। এই যে সদানন্দ দুর্ব্বোধ লোকটী! যাহার ব্যবহার শিষ্টাচারের সীমা পার হইয়া কোন দিনই এক চুলও অগ্রসর হইল না, তাহারই নিকট আজ আত্ম-প্রকাশের অপমান সীমা বহন করিবে নাকি। প্রাণপণে সে আপনাকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

হিরণ ধীরে ধীরে বলিল—'মিস রায়! এইমাত্র যে কাজটী আপনি করে এলেন সেটা কি আগে বেশ সুস্থ মনে ভেবে দেখেছিলেন। যে সৌভাগ্য আপনি আজ প্রত্যাখ্যান করে এলেন, আপনি জানেন কি, মিষ্টার আর মিসেস রায় অনেক চেষ্টায় এটাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। আর আপনার এই অবাধ্যতা তাঁরা হয় তো ক্ষমা করতে পারবেন না, এর জন্যে হয় তো আপনাকে অনেক কষ্ট সহ্য কত্তে হবে, এ সব ভেবে দেখেছেন।'

সীমা দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিল। এতক্ষণের সঞ্চিত অশ্রু মুক্ত-ধারায় ঝরিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আপনার অন্তরকে বিশ্লেষণ করিয়া যে সত্য সে জানিয়াছে, তাহা এই মায়াবী

রাত্রির মোহময় আবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া যাহার নিকট অনাবৃত করিতে পারিলেই জীবনের সকল সার্থকতার আনন্দ পাওয়া যায়, তারই মুখের এই নির্লিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে সে কেমন করিয়া বলিবে—তুমি তোমার ওই দুটি অনুপম চোখের দৃষ্টি দিয়া প্রতি দেখায় যে কথা আমায় বলিয়াছ তারই মাদকতায় মন আমার সকল ভাল মন্দের ভাবনা ভুলিয়াছে। হিরণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সীমার ক্রন্দন-কম্পিত দেহের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল—'আমাকে আপনার কিছু বল্‌বার আছে কি ?'

সীমা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, কিছুই তাহার বলিবার নাই। হিরণ আবার খানিক চুপ করিয়া তেমনি চাহিয়া রহিল। তারপর অতি কোমল সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—'এখনই এত কাঁদছেন কেন মিস রায়! এই জন্য যদি আপনাকে খুব কষ্ট পেতে হয় ওঁদের কাছে, তা হ'লে যদি দয়া করে আমাকে জানানো দরকার মনে করেন তো আমি আপনাকে কোন রকম সাহায্য কত্তেই কুণ্ঠিত হবো না। আপনার জন্যে যে কোনও কাজ কত্তে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে কোরব, যদিও নিজেকেই চালিয়ে নেবার মত আমার ক্ষমতা নেই, তবু আপনি যদি ইচ্ছা করেন তা' হ'লে আপনার সমস্ত ভার আমি সারা জীবন আমার সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে বহন করব।'

একটু পরে সীমা আপনাকে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হিরণ মুখ তুলিয়া সীমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মধ্য রাত্রের উজ্জ্বল অনাবৃত চন্দ্রালোক হিরণের মুখের উপর লুটাইয়া পড়িল। সীমা একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল।

১৩

পরদিন সকালে উঠিয়াই সরোজিনী দাসীর নিকট শুনিলেন, কাল অনেক রাত্রে সীমা একা হিরণের সঙ্গে বাড়ী আসিয়াছে। শুনিয়াই অসহ্য ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, বাহির হইতে মুরলীবাবুকে ডাকিতে বলিয়া বসিবার ঘরে গিয়া একখানি কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন।

মুরলীবাবু অসময়ে ডাক শুনিয়াই বুঝিলেন, কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শঙ্কিত চিত্তে ভিতরে আসিয়া সরোজিনীর মুখ দেখিয়াই প্রমাদ গণিলেন।

ইহার পশ্চাতে কোন প্রলয় যে প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ডেকেছ কেন, শরীর কি খারাপ বেশি বোধ কচ্ছ ?'

গম্ভীর কণ্ঠে 'না' বলিয়া সরোজিনী উঠিয়া বসিয়া সকল কথা বলিয়া এখনই ইহার প্রতিকার করিতে বলিলেন। মুরলীবাবু সমস্ত শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়া সীমাকে ডাকিতে বলিয়া, দাসী চলিয়া গেলে মৃদু স্বরে বলিলেন—'কি যে হোল কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

সরোজিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—'আমি সবই বুঝেছি, জানি অমন মা-বাপের মেয়ে অমনিই হয়ে থাকে। আমি চেষ্টা করলেই কি ওকে ভাল কত্তে পারবো, ওর রক্তের দোষ যে। আমি কিন্তু তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, কাল ও যদি রাজাকে চটিয়ে এসে থাকে, আর এ বিয়ে

যদি না হয়, তা হলে ওকে আমার বাড়ীতে রেখে আর সকাল সন্ধ্যে ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে বেড়াতে দিয়ে, লোক হাসাতে আমি দেব না। এত বড় যার সাহস, যাক্ সে দূর হয়ে যেখানে খুসী, আমার বাড়ী এ সব চলবে না।' মুরলীবাবু নিরুত্তরে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে সীমা তার স্বাভাবিক ধীর গতিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মুরলী বাবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যময় মুখখানি তার মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র পাওয়া গোলাপের মত ম্লান, সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখ দুটী আরক্ত, সর্ব্ব-অবয়বে একটা ক্লান্ত করুণতার ছাপ।

মুরলীবাবুর সমস্ত মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। ভাবিলেন—হায়! নীড়হারা পক্ষিশাবকের মত অসহায় এই বালিকা তাঁহার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু দুর্য্যোগ রজনীর ঝঞ্ঝা হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন কই!

সীমা কাছে আসিতেই মুরলীবাবু বলিলেন—'কাল রাত্রে রাণীমা তোমাকে তাঁর কাছে রাখবার জন্যে খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, তাই আমরা তোমাকে সেখানে কাল রেখে এসেছিলুম; কিন্তু তুমি অত রাতে একা চলে এলে কেন মা?'

মুরলীবাবুর কণ্ঠের কোমলতায় সরোজিনী বিরক্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়া মুখ ফিরাইয়া রাখিলেন। সীমা স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল 'আমায় একা কেন রেখে এলেন জ্যেঠা মশায়?'

মুরলীবাবু বলিলেন—'তুমি বড়ো হয়েছ, বুঝেছ নিশ্চয় ওঁরা যে সৌভাগ্য তোমায় স্নেহ করে দিতে চাইছেন সেটা আমাদের কল্পনারও অতীত। ওদের সেই অনুগ্রহে আমরা যে কতটা ধন্য হয়েছি সেটা ওদের

জানিয়েছি, সেই জন্যেই ওঁরা তোমায় রাখতে চেয়েছিলেন, আর দুদিন পরে ওই খানেই তো তুমি থাকবে মা, ওই সব সুখ ঐশ্বর্য্য সবই তো তোমার হবে মা।'

সীমা মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'এ সৌভাগ্য হয়তো খুব বড়; কিন্তু আমি তো একে নিতে পারবো না। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে চাই।'

সরোজিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীব্র শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'তা তো চাইবেই, না হলে ওই হাঘরেটার সঙ্গে রাতদিন বেড়ান হবে কেন। কিন্তু এখানে ও সব মায়ের বিদ্যে আর বাপের শিক্ষা চলবে না, বাপ এতদিন ওই সব শেখাবে বলেই বিয়ে দেয়নি............'

সীমা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার জীবনের একমাত্র শ্রদ্ধার আধার পিতা, যাহার অপেক্ষা দেবতাকেও সে বড় বলিয়া ভাবিতে পারে না। সেই লোকান্তরিত পিতার অপমান সীমাকে জ্ঞানহারা করিয়া দিল। সে সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিল—'খবরদার, আপনি আমার বাবাকে অমন করে অপমান করবেন না যা' তা' বলে।'

সরোজিনী উঠিয়া বসিয়া ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন 'ওরে বাবা মেয়ের আবার তেজ দেখ, উনি আমার বাড়ী বসে যা খুসী করবেন আমি বলবোনা কিছু। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে, দূর হ' কালামুখী।'

সীমা সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুরলীবাবু প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় হিরণের হাত ধরিয়া অনু ঘরে ঢুকিয়াই সীমাকে কাঁদিতে দেখিয়া দৌড়াইয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে সীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্র কান্নাভরা কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল 'দিদি! দিদি!'

হিরণ নির্ব্বাক্ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া সীমার দিকে চাহিয়া রহিল। সরোজিনী ঠিক এই সময় এই অপ্রিয়, তাঁহার এত আশার অসাফল্যের একমাত্র মূল, লোকটাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। অনুর ডাকে মুখ তুলিয়া সীমা সম্মুখেই হিরণকে দেখিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত রোদন-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—'আমি এখান থেকে যেতে চাই, তুমি, তুমি নিয়ে চলো আমায়।'

হিরণ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—'ব্যস্ত হয়োনা সীমা! ওঠো, অনুকে নিয়ে বাইরে যাও।'

হিরণের দুটী চোখের গভীর দৃষ্টিতে সীমা যে অভিনন্দনের আলোকোৎসব দেখিতে পাইল, তাহাতেই তাহার মন হইতে অপমানের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। সে অনুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মুরলীবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হিরণের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলেন। সরোজিনীর অতিরিক্ত ভদ্রতাবোধ আর স্বার্থবোধ এতক্ষণ মহারাজ দলমীরের অতিথিকে অসম্মান করিতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল; কিন্তু এখন আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, গম্ভীরভাবে বলিলেন—'কোন ভদ্র কুমারীকে নাম ধরে ডাকা যে অভদ্রতা, এটা কি আপনি অস্বীকার করেন মিঃ সেন!'

হিরণের সুন্দর হাসিটি তাহার ঠোঁটের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে তার স্বাভাবিক মিষ্ট কণ্ঠে বলিল—'কিন্তু কোনও কুমারী যদি স্বেচ্ছায় তাঁর নাম নেবার অধিকার কোন ভদ্রলোককে ছান, তা হ'লে বোধ হয় দোষ হয় না। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?'

অসহ্য ক্রোধে অধীর হইয়া বিদ্রূপের স্বরে সরোজিনী বলিলেন—'তাই নাকি? কিন্তু আমি জানতুম সে অধিকার আমরা যাকে দেব সেই পাবে। কুমারীটী যদি দয়া করে আমাদের জানাতেন যে সে অধিকার তিনি নিজেই দিয়ে রেখেছেন, তা'হলে আমরা আর এমন অপমান হতুম না।' হিরণ বেশ সহজভাবে বলিল—'সব সময়ই কি আমরা যা জানি, যা ভাবি তা ঠিক হয় মিসেস রায়! পরে তার জন্যে দুঃখ করেও কোনও ফল হয় না। শুধু শুধু মন খারাপ করে আর কি করবেন বলুন। অনেক বিরক্ত করলুম ক্ষমা করবেন, এখন চল্লুম।'

সরোজিনী কোনও উত্তর দিলেন না। হিরণ চলিয়া গেল।

১৪

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা মুরলী বাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া মিসেস মিত্র সরোজিনীকে বলিতেছিলেন—'সরোজিনী তুমি দুঃখ কোর না, না থাক পয়সা, তবু মানুষ হিসাবে হিরণ রাজার চেয়ে ঢের বড়। সীমা সে দিক থেকে দেখতে একটুও ভুল করেনি। আশাভঙ্গের দুঃখে তুমি এখন বুঝতে পাচ্ছ না, পরে ভেবে দেখো সীমা ভালই করেছে। সীমার মত মেয়ে কি কখনও হিরণের উপস্থিতিতে রাজাকে মালা দিতে পারে। পয়সাটাই তো সব নয় সরোজিনী। এটা খাঁটী সত্যি কথা যে, সীমার সম বয়সে আমি নিজে যদি এমন অবস্থায় পড়তুম, তো সীমা যা করলে আমিও ঠিক তাই করতুম, তাই তুমি এতে ওর ওপর রাগ করলেও আমি ওকেই সমর্থন করবো।'

মিসেস মিত্রের কথাগুলি সরোজিনীর ভাল লাগিল না, তবুও তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি জানিতেন এই ঐশ্বর্য্য-শালিনী সুচরিত্রা বিধবা নারীকে সহরের সকল সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধা করিত। পরিচিত অপরিচিত সকলের জন্যই এই মমতাময়ী নারীর স্নেহপূর্ণ অন্তরটী উন্মুক্ত ছিল। প্রয়োজনের দিনে অর্থসামর্থ্যের অযাচিত সাহায্য লইয়া সকলের দ্বারেই তিনি অসঙ্কোচে প্রবেশ করিতেন। বিশেষ করিয়া সহরের অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমতী বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। তাই সকলের কাছে তার মতের একটা মূল্য ছিল।

সরোজিনীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিসেস মিত্র আবার বলিতে লাগিলেন—'আহা দুঃখ হয় শুধু বুড়ো রাণীর জন্যে। বেচারী অনেক দিনের পর একটু খুসি হয়েছিল, তেমনি দুঃখও পেলে। আজই সকালে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যেতেই রাজা যাবার সময় ওঁকে যে চিঠিটা লিখে গ্যাছে সেটা আমার হাতে দিয়ে সে কি কান্না! বলেন—মন্দা, আমার কপালে শেষে এই ছিল কোথায় অমন বউ ঘরে এনে দুদিন শান্তি পাব, না ছেলে শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলুম, 'আর কি বিনয় ফিরবে, আর কি তাকে দেখতে পাব।' কি বলে যে বুড়ীকে শান্ত করি ভেবেই পাই না, সমস্ত দিন তো আজ তাঁরই কাছে কাটল আমার, আহা বেচারী।'

সরোজিনী এইবার কথা বলিলেন—'রাজা কি লিখেছেন?'

মিসেস মিত্র বলিলেন 'ছোট চিঠি, লেখা আছে—"সীমা আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে, কেন করেছে তা জানি, তাই যদি কোনও দিন প্রতিশোধ দিতে পারি তবেই ফিরবো।"

সরোজিনী বলিলেন—'আহা মানী লোক, এত বড় অপমান; কত দুঃখেই দেশ ছাড়লেন।'

মিসেস মিত্র বলিলেন—'যাই বলো তুমি, রাজার জন্যে আমার একটুও দুঃখ হয় না, ওই আত্ম-সর্ব্বস্ব লোকটী চিরদিন নিজের খেয়াল নিয়েই রইলো। একটিমাত্র ছেলে হয়ে কোনও দিন মার দিকে একটু দেখলে না। নাই বা সীমা বিয়ে করলে, তার জন্যে আবার প্রতিশোধই কি, আর দেশত্যাগই বা কেন। যাই তুমি ভাবো,

সীমা খুব বেঁচে গ্যাছে! ওই খেয়ালী রাজা কোনও দিন ওকে শান্তি দি'ত না, একটা একটা খেয়াল নিয়ে ওকে জ্বালাত।'

মুরলীবাবু এতক্ষণ একপাশে বসিয়া মিসেস মিত্র আর সরোজিনীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার তেমন কোনও সুখ দুঃখ বোধ ছিল না। সীমা নিজের রাণীগিরি নষ্ট করিয়া ফেলায় তাঁহার রাগের অপেক্ষা ইহার জন্য সীমা যে নির্য্যাতন ভোগ করিবে তাহারই কল্পনায় দুঃখ হইতেছিল বেশি। সরোজিনীর মন একটা গভীর দুঃখে ভরিয়া ছিল। এত বড় খবর কুটুম্বিতা করিয়া সমপদস্থ লোকের কাছে যে সম্মান পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটা বুদ্ধিহীনা বালিকার অবিবেচনায় তাহা নষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার আপশোষের আর অন্ত ছিল না। তাই সমস্ত দিন ধরিয়া তাঁহার ক্ষমাহীন ক্রোধের পরিচয় পাইয়া সীমার জন্য মুরলী বাবু বিশেষ শঙ্কিত হইয়া ছিলেন। কেমন করিয়া সরোজিনীর নিয়ত নির্য্যাতন হইতে সীমাকে যে রক্ষা করিবেন, তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। চিরদিনের অভ্যাসমত নিজের সাংসারিক ব্যবস্থায় নিরুদ্বেগ অপটুত্ব আজ তাহাকে বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সরোজিনীর সহিত বিনা পরামর্শে অজ্ঞাতপরিচয় হিরণের হাতে সীমার সকল দায়িত্ব তুলিয়া দিতে তিনি সাহস পাইতেছিলেন না। এখন মিসেস মিত্রকে হিরণকে সমর্থন করিতে দেখিয়া তিনি যেন স্বস্তিতে নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন। সারাদিনের পর কতকটা সুস্থ মনে সেদিনের অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করিতে বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই মিসেস মিত্র বলিলেন—'মিঃ রায় আপনি উঠছেন নাকি! আমার দুটো

কথা আছে যে, পরশু সন্ধ্যায় আমার ওখানে সরোজিনীকে নিয়ে যাবেন একবার দয়া করে, অনেক দিন তো কেবল সবার বাড়ী খেয়েই বেড়াচ্ছি এবার তাই একবার সকলের মুখ মিষ্টি করে না দিলে চলছে না। কিন্তু একা আমি কি যে করবো, ভেবেই পাচ্ছি না। আপনি যদি একটু দয়া করেন তো আমি খুব সাহায্য পেতে পারি।'

মুরলীবাবু বলিলেন—'আপনি ও রকম করে কেন বলছেন আমি কি কত্তে পারি বলুন কিছু কত্তে পারলে আমরা খুব আনন্দ পাব।'

মিসেস মিত্র বলিলেন, 'আপনার সীমাকে যদি দুদিন রাখেন আমার কাছে ভারী উপকার হয় আমার।'

মুরলীবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিসেস মিত্রের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন এই মমতাময়ী কি মানুষের অন্তরও দেখিতে পান। সীমাকে সরোজিনীর নিকট হইতে আড়াল করিবার ইচ্ছা তাই এই করুণা ময়ী এমন করিয়াই পূর্ণ করিলেন। তিনি সাগ্রহে বলিলেন—'স্বচ্ছন্দে ওকে নিয়ে গিয়ে যতদিন ইচ্ছা রাখুন ও তো আপনার ও।'

মিসেস মিত্র সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'তোমার কোন অসুবিধা হবেনা তো ?'

সরোজিনী বলিলেন 'না।' এই চক্ষুশূল মেয়েটাকে এখন বাড়ী থেকে তাড়াইবার জন্যই তিনি ব্যগ্র ছিলেন, তাই অন্ততঃ দুদিনের জন্যও মেয়েটা দূরে যাইবে ভাবিয়া স্বস্তিই পাইলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সাময়িক স্বস্তি দিয়া স্নেহশূন্য অসহায় ব্যথাভরা অবস্থা হইতে সীমাকে আপনার অতৃপ্ত সন্তান-স্নেহের ক্ষুধিত বুকে টানিয়া লইয়া মিসেস মিত্র বাড়ী ফিরিলেন।

১৫

রাত্রি প্রায় আটটা।

মিসেস মিত্রের প্রকাণ্ড হলটী তাঁর নিমন্ত্রিতদের হাস্যালাপ মুখর। সীমাকে মিসেস মিত্র আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, সে এক পাশে একখানি সোফায় বসিয়া এই সব সম্ভ্রান্ত অতিথিদের আলাপনগুলি শুনিতেছিল, তাহার সকলগুলিই প্রায় রাজা, হিরণ ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উঠিতেছিল। ছোট ছোট দলগুলি ঈষৎ বিচ্ছিন্নভাবে বসিয়া আপন আপন রুচি ও পছন্দ মত আন্দাজ ও আলোচনা করিয়া এমন সম্মীলিত অবসরটুকু সুখ ভোগ করিতেছিলেন। আপনাদের বক্তব্যগুলিকে বুদ্ধিসিক্ত সুখশ্রাব্য ও সুমার্জ্জিত করিবার বিদ্যা ইঁহাদের সকলেরই বেশ আয়ত্ত থাকিলেও তাহারই দু' একটি টুকরা সীমার কাণে আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে ঈষৎ আরক্ত করিয়া ফেলিতেছিল। সে উঠিবার জন্য ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়াও উঠিতে পারিল না—মিসেস মিত্র তাহাকে এখানেই বসিতে বলিয়াছেন। চারিদিকে চাহিয়া সে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় সরোজিনী ও মুরলীবাবুর সহিত তিনি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন —'এই যে সীমা তোমার জেঠা মশাইরা এসেছেন।'

সীমা বিপন্ন ভাবে উঠিয়া তাঁহাদের নিকট যাইতেই সরোজিনী তাহার সর্ব্বাঙ্গে একবার চোখ বুলাইয়া মুখটা ফিরাইয়া লইয়া পাশের দিকে চাহিয়া

একটী স্থূলাঙ্গিনী মহিলার সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সীমা জানিয়াছিল সেই মহিলাটির পরিচয়, তিনি এখানকার জজ বাহাদুরের পত্নী, তিনটি বয়স্থা কুমারী কন্যার মাতা, সহরের সকলগুলি ভোজে সু-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া কন্যাগুলিকে লইয়া যাওয়া ও সুন্দর সুবেশ যুবকগুলির সহিত অযাচিতভাবে পরিচিত হইয়া কন্যাগুলিকে পরিচিত করাইয়া দেওয়া ছিল তাহার মাতৃ কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। তবুও কন্যাগুলি কুমারীই রহিল বলিয়া তাঁহার আক্ষেপের অন্ত ছিল না। ইহারই জন্য মুরলীবাবুর বাড়ী প্রথম দিনই সীমাকে ইনি সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু হিরণের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহারই পরিচয় প্রগাঢ় হইয়াছিল। পর পর দুইটি ভোজে প্রায় সব সময় টুকু সকন্যা জজ গৃহিণী কাটাইয়াছিলেন—হিরণের সান্নিধ্যে। আজ এতক্ষণ ধরিয়া ইহার অম্লমধুর বাক্যগুলিই সীমার কর্ণ দুটীকে অধিক আরক্ত করিয়া তুলিতে-ছিল। সরোজিনীকে এই মহিলাটীর দিকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়া সীমা একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। মিসেস মিত্র এতক্ষণ মুরলীবাবুর নিকটে বসিয়া দুই একটি কথা বলিতে-ছিলেন। হিরণ এখনও আসিল না দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি বাহিরে আসিতেই দেখিলেন—হিরণ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে। তিনি হিরণের দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিমুখে বলিলেন—'এস, এস বিজয়ী বীর, তোমাকে অভিনন্দন দেবার জন্যেই আমার আজকের আয়োজন, আর তোমারই এত দেরী।' হিরণ উঠিয়া মিসেস মিত্রের নিকট দাঁড়াইয়া সুন্দর একটু হাসির সহিত মধুর সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিল—'সৌভাগ্য আমার, এর জন্যে মুখে ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করে দেব না মিসেস মিত্র।'

মিসেস মিত্র আবার হিরণকে লইয়া হলে ফিরিতেই সেখানে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। হিরণের এই অল্প দিনের পরিচিত মহিলারা কল কণ্ঠে হিরণের সৌভাগ্যকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পুরুষরা মিষ্ট পরিহাসের সহিত আপনাদের আনন্দ জানাইতে লাগিলেন। তরুণ যুবকরা গোপন ঈর্ষার উচ্ছ্বসিত আবেগ লইয়া আপনাদের আনন্দ জানাইবার অপেক্ষা হিরণের নগণ্যতাই প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন অধিক। হিরণ বিনীত হাসির সহিত সবগুলিকেই স্বীকার করিয়া লইতে লাগিল।

সাধারণ প্রথামত আনন্দ জানাইবার রীতির মধ্য দিয়া হিরণের দারিদ্রের প্রতি সকলের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সীমার সহ্য হইল না। শিক্ষা-গর্ব্বিত মার্জ্জিত মনোবৃত্তি এই লোকগুলির আলাপের গতি এতক্ষণ ধরিয়া তাহাকে যে আঘাত দিতেছিল তাহাতেই তাহার মন ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, এইবার সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া মিসেস মিত্র এই কয়দিনের জন্য তাহাকে যে ঘরখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে গিয়া শয্যার উপর ক্লান্ত ভাবে শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—হায়রে! মাত্র কয়দিন আগে রাজবাড়ীতে এই লোকগুলাই এমনি করিয়াই আমার সৌভাগ্যকে স্বীকার করিয়াছিল, আজ সেই ঐশ্বর্য্য গর্ব্বী রাজার পরিবর্ত্তে দরিদ্র হিরণকে দেখিয়াই ইঁহাদের বিচার বদল হইয়া গেল। সংসারে মানুষ সত্যই কি অর্থকেই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাটি বলিয়া ব্যবহার করে, বিদ্যা, চরিত্র, রূপ, আচার, এ সবের কোনও মূল্যই কি এরা সত্যই স্বীকার করে না,······সীমার চিন্তায় বাধা দিল হিরণের

কণ্ঠস্বর, সে চোখ খুলিয়া দেখিল ঈষৎ উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া হিরণ বলিতেছে 'তুমি কি সুস্থ নেই সীমা?'

সীমা একটু ম্লান হাসির সঙ্গে উত্তর দিল—'ভালই আছি আমি।'

হিরণ সীমার মাথার নিকট বসিয়া তাহার কপালের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—'তবে মুখ এত বিষণ্ণ কেন? ও ঘর থেকে চলে এলে কেন, সীমা!'

'ভারী খারাপ লাগছিল আমার, ওদের কথাগুলা, তুমি কেন অমন করে স্বীকার করে নিচ্ছিলে সব।'

হিরণ কোমল কণ্ঠে বলিল—'যা সত্যি, তা স্বীকার না করলেই কি মিথ্যে হয়ে যায় সীমা!'

সীমা তার সহজ নম্র কণ্ঠের তুলনায় ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'সত্যি! কিসে সত্যি তোমার কি এমন কিছুই নেই যাতে'—সীমা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই থামিয়া গেল। হিরণ হাসিয়া বলিল—কি আমার আছে সীমা, যাতে আমি তোমার মতো রাজ-বাঞ্ছিতকে পেতে পারি। অতবড় রাজার ঐশ্বর্য্য যাকে মুগ্ধ কত্তে পারলে না, আমার মতো একটা হতভাগা, যার ভোজে যাবার একটা পোষাক করবারও ক্ষমতা নেই,—সব জায়গায় একই পোষাকে ঘুরে বেড়ায়, সেইই, তাকে মুগ্ধ করে ফেললো যে কেবলমাত্র ভাগ্যের অনুগ্রহে এ যে সকলেই বলবে, শুধু তুমিই কি একে অস্বীকার করবে সীমা।'

সীমা স্থির অচঞ্চলা কণ্ঠে বলিল—'নিশ্চয়, কেন না আমি জানি মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে কেবলমাত্র মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য,...... সীমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শোনা গেল মিসেস মিত্রের কণ্ঠ,

সীমাকেই তিনি ডাকিতেছেন। সীমা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল হিরণ প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেও সেইদিকে গেল।

১৬

মিসেস মিত্রের সযত্ন তত্ত্বাবধানে সকলে আহার শেষ করিয়া আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে মিসেস মিত্র বলিলেন—'আমি তোমাদের একটি আশ্চর্য্য খবর শোনাবো এবার।'

সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন—'বলুন বলুন কি এমন খবর।' মিসেস মিত্র সরোজিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমার বোধ হয় মনে আছে সরোজিনী! বছর খানেক আগে আমার ভাইপো অসিত এসে এখানে কিছুদিন ছিল।' সরোজিনী বলিলেন—'হ্যাঁ, সেই সুন্দর মত ছেলেটী তো? খুব চটপট কথা বলে, প্রায়ই গিয়ে দলমীর প্রাসাদে বসে থাকতো, তাকে মনে আছে বৈকি।'

মিসেস মিত্র বলিলেন—'হ্যাঁ, সেই অসিত, সে দলমীর প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সারাটা দিন ওই খানেই থাকত, সন্ধ্যে বেলা বাড়ী এসে মহারাজ দলমীরকে কত কিই যে বলতো তার ঠিক নেই, এমন বাড়ী এমন দৃশ্য না দেখে মহারাজ যে অযত্নে নষ্ট করে ফেলছেন এ অপরাধ সে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারতো না। রোজই সে এই সব নিয়ে আলোচনা করতো। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হোল রাত্রে খাবার সময় আমায় বল্লে—আচ্ছা পিসিমা! মহারাজ তো বাড়ীটা ফেলে রেখে নষ্টই কচ্ছেন, আমি যদি ওটা তাঁর কাছে চাই বাস করবার জন্যে তা হ'লে কি হয় বল তো! আমি তখন তাকে বলেছিলাম—

মহারাজকে নাকি আদ্ধেক দিন খুঁজেই পাওয়া যায় না, তার ওপর তাঁর যা প্রকৃতি তাতে ও কথা শুনে বাড়ীতো দেবেনই না আরও কি করেন তার ঠিক নেই, ও সব পাগলামি না করাই ভালো।.........'

হিরণ এই সময় বলিয়া উঠিল—'দেখুন মহারাজ যদি ভালো লোকও হতেন তাহলেও ওই প্রাসাদ কারুকে বাস করবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব, আপনারা কি বলেন ? একজন মহারাজ তাঁর বাড়ী যাকে তাকে বাস করবার জন্যে ছেড়ে দিতে পারেন ?—তিনি নিজে না বাস করলেও এটা তাঁর পূর্ব্বপুরুষের প্রাসাদ তো—এ ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।'

মিসেস মিত্র একটু হাসিয়া বলিলেন—'কিন্তু হিরণ তোমার মহারাজ এই অসম্ভবকে সম্ভব করে অসিতকে দলমীর প্রাসাদে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস করবার অনুমতি দিয়ে আশ্চর্য্য করে দিয়েছেন। অদ্ভুত মহারাজের অসংখ্য অদ্ভুত কাজের মধ্যে এটাও একটি আর কি।'

সমস্ত লোকই বিস্ময় চঞ্চল হইয়া মিসেস মিত্রকে অসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মিসেস মিত্র বিব্রত হইয়া অসিতের পত্রখানি আনিয়া সকলকে পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন—

পিসিমা! তোমার কাছ থেকে আসবার আগের দিন রাত্রে তোমায় বলেছিলুম তোমাদের ওখানকার মহারাজ দলমীরের অপূর্ব্ব সুন্দর প্রাসাদটী আমি তাঁর কাছে বাস করবার জন্য চাইবো। তুমি তখন আমায় ভয় দেখিয়ে বারণ করেছিলে। তোমার সে কথা মনে আছে নিশ্চয় ? কিন্তু তুমি শুনে অবাক্ হয়ে যাবে পিসিমা, মহারাজ আমার কথা শুনেই বাড়ীটা আমায় ছেড়ে দিয়েছেন আমার যতদিন ইচ্ছে

থাকবার জন্যে, আশ্চর্য্য নয় কি ?

এইবার বলি কোথায় তাঁকে পেয়েছিলুম। একটি বছর চেষ্টা করে বোম্বাই থেকে খানিকটা দূরে বেলারী বলে একটা ছোট্ট গ্রামের একটা হোটেলে তাঁর দেখা পেয়েছিলুম। এই গ্রামখানির দৃশ্য ভারী স্থন্দর। তোমাদের দলমীরের চেয়ে ভাল। এটা নাকি মহারাজের খুব প্রিয় স্থান। তোমাদের ওখানে থাকতে মহারাজের নামে যে কলঙ্কের কথা শুনেছিলুম সেটা বোধ হয় সত্যি আর সেই ঘটনাটা বোধহয়—

পত্রের এই খানে মিসেস মিত্র থামিয়া হিরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন —তোমার কাছে এটা পড়া বোধ হয় ঠিক নয় তুমি মহারাজের বন্ধু—

হিরণ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—'দেখুন আমি সামান্য লোক, আমায় মহারাজের বন্ধু বল্লে উপহাস করা হয়। তিনি আমার উপকারী বটে, তবে তার জন্যে যা সত্য তাকে তো আমি অস্বীকার কত্তে পারি না। আর মহারাজের কিই বা আমি জানি, কত টুকুরই বা পরিচয়।'

মিসেস মিত্র বলিলেন—'সত্যই এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আমরা কেউই পাইনি, সবই জনরব মাত্র—অনেক সময় অনেক মিথ্যাও তো এমনিই প্রচার হয়।

হিরণ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল—'কিন্তু সে সব বিচারের চেয়ে আমরা এখন আপনার চিঠিটা শুনতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেইটেই পড়ুন আগে।'

মিসেস মিত্র আবার পড়িতে লাগিলেন—

সেই ঘটনাটা বোধহয় এখানেই ঘটেছিল। এখানে পথে একটা পাগলী দেখা যায়, বেশ সুন্দরী যুবতী। সে মহারাজের সম্বন্ধে এমন সব

কথা বলে যে, মনে হয় মহারাজ অনেক কিছু কলঙ্কেই লিপ্ত। তাকে দেখলে সত্যি ভারী কষ্ট। হয় কোন জ্ঞান নেই, রাতদিন শুধু মহারাজের কথাই বলে বেড়ায়। এখানকার লোকেরাও বলে, পাগলী যা বলে, তা নাকি সত্যি। মহারাজ নাকি চরিত্রহীন, খুনী। কিন্তু অতবড় লোক যে এমন খারাপ এ যেন বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছা করেনা। তাঁকে দেখলে এমন ভাল মনে হয়, আর আমার সঙ্গে তিনি খুব ভাল ব্যবহার করেছেন—তাই আমার তাঁর সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করা উচিত নয়।

এখন তোমায় একটা কাজের ভার দিয়ে এই চিঠিটা শেষ করবো। মহারাজ আমায় যে অনুমতি পত্রখানি দিয়েছেন সেটা এই সঙ্গেই তোমায় পাঠালুম। এখানি তুমি মুরলীবাবুকে দিলে তিনি তোমায় দলমীর প্রাসাদের চাবী দেবেন। তুমি প্রাসাদটী একটু পরিষ্কার করিয়ে যেখানে যেখানে দরকার সারিয়ে রেখ। আমি যত শীগ্‌গীর পারি যাব, পনের দিনের বেশী আমার দেরী হবে না, এর মধ্যে সব ঠিক হবে তো ? তোমার চিঠির জন্য এখানে আমি আরো সাত দিন অপেক্ষা করবো, তারপর এখান থেকে চলে যাবো—এর মধ্যে আমায় জানাও।

মিসেস মিত্র থামিলেই সকলে এক সঙ্গে মহারাজের কথা আলোচনা আরম্ভ করিলেন। হিরণ হাসি মুখে বলিল—'অসিতবাবু বেশ কাজের লোক দেখছি। আমি মনে করতুম আমিই একমাত্র লোক যে মহারাজের পূর্ব্ব পুরুষের জিনিষ ব্যবহার করবার অনুমতি পেয়েছে। অসিতবাবু দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে গ্যাছেন, অমন বাড়ীটাই বাস কত্তে পেলেন।' তরুণ ব্যরিষ্টার শিশির উঠিয়া—বলিল 'আরে মশাই কাজের ফাজের কোন কিছুই মানে নেই, সব রাজা রাজড়ার খেয়াল। এই দেখুন না রাজা

বিনয়েন্দ্র কি করলেন, যখন মিস রায়কে বিয়ে করবো বলে সব ঠিক করলেন তখন তাঁর মত জানবার খেয়াল হোল না। তার পর সকলকে বলে ফেলে, শীগ্‌গীর বিয়ের ভোজের আশা দিয়ে গেলেন মত জানতে, যেই শুনলেন মত নেই ব্যস অমনি একেবারে দেশত্যাগ। আপনার অবিশ্যি কপাল জোর বলতে হবে, কিন্তু রাজার এটা আগাগোড়া একটা খেয়াল। সত্যি ইচ্ছা থাকলে তিনি কখনও চলে যেতেন না। যে রকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল, একটু চেষ্টা করলে বিয়েটা হয়ে যেত। শুধু শুধু একটা গোলমাল করলেন মত জানবার খেয়ালে। যাক এখন রাজা মহারাজার আলোচনায় আর থাকতে চাইনা।'

মিসেস মিত্র উঠিয়া বলিলেন—'দুঃখ কেন শিশির! হিরণ তোমাদের ভোজটা ত একেবারে মাটী করেনি, রাজবাড়ীর ভোজের মত না হলেও কিছু তো আশা আছে, কি বলো তুমি?'

শেষের কথাগুলি তিনি হিরণের দিকে চাহিয়া পরিহাসপূর্ণ স্বরে বলিলেন। হিরণ হাস্যপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল—'আমি বলি আশা সব সময়ই কুহকিনী, তাই পূর্ণ না হলে বিশ্বাস নেই।'

কথা গুলি বলিবার সময় হিরণ অদূরে উপবিষ্টা সীমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

শিশির সকলের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। শিশির উঠিয়া যে কথাগুলি বলিয়া গেল তাহাতে সকলের আলোচনাই যেন আর অগ্রসর হইল না। সকলেই একে একে উঠিয়া বিদায় লইতে লাগিলেন। মুরলী বাবু যাইবার সময় মিসেস মিত্রকে বলিলেন—'আজ তাহলে আমরা যাই, কাল প্রাসাদের চাবিটা আপনাকে পাঠিয়ে দেব কি? অনেক দিনের বন্ধ

বাড়ী। ভিতরটা তো খোলা হয়নি খুব খারাপ হয়ে আছে পরিষ্কার কত্তে সময় লাগবে। বাইরেটা মাঝে মাঝে সারিয়ে রেখেছি তাই তেমন খারাপ দেখায় না, কিন্তু ঘরগুলা তো মহারাজের বিনা হুকুমে খোলা যায় না। তাই বিশ বছর ধরে বন্ধ আছে, বুঝতেই পাচ্ছেন কি অবস্থায় আছে সে গুলো।'

মিসেস মিত্র চিন্তিতভাবে বলিলেন—'তাই তো অসিত এই ভার দিয়ে আমায় ভারী বিপদে ফেলেছে। এত দূর থেকে রোজ গিয়ে দেখে শুনে সারানো আমার পক্ষে কঠিন হবে।'

মিসেস মিত্রের বিপন্ন ভাব দেখিয়া হিরণ বলিল—'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে এ বিষয় আমি আপনাকে সাহায্য কত্তে পারি। আমি তো ওখানেই থাকি অবসরও যথেষ্ট, যদি বলেন তো আপনি একদিন দেখে এসে কি কত্তে হবে আমায় বলে দেবেন আমি সেই রকম মিস্ত্রিদের দিয়ে করিয়ে নেব। মাঝে মাঝে অবসর মত আপনি দেখে আসবেন ঠিক হচ্ছে কিনা।'

মিসেস মিত্র কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'তোমার এমন সাহায্য পেলে তো আমি বেঁচে যাই হিরণ, আমার কিছু বলে দেবার দরকার নেই তুমি যা বুঝবে তাই করাবে। আপনি তা হলে মিষ্টার রায় চাবিটা কাল হিরণকেই দেবেন। আর মহারাজের অনুমতি চিঠিটা নিয়ে যান এটা আপনার কাছেই থাকা দরকার বোধ হয়।'

মুরলী বাবু চিঠিটি লইয়া সীমাকে সঙ্গে লইবার কথা বলিলেন। কিন্তু মিসেস মিত্র আরো কিছু দিন রাখিবার জন্য অনুরোধ করায় তাহাকে রাখিয়াই বিদায় লইলেন। সরোজিনীর সমস্ত মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল

হিরণের উপর প্রাসাদ সারাইবার সমস্ত ভার পড়িল দেখিয়া। ইহার উপর আবার এই চক্ষুশূল মেয়েটাকে সঙ্গে লইতে হইল না, ইহাতে তিনি একটু সুস্থই বোধ করিয়া বাড়া ফিরিলেন।

———

১৭

পরদিন হইতেই মহা সোরগোল করিয়া বহুদিনের রুদ্ধ দলমীরপ্রাসাদ পরিষ্কার আর সংস্কার আরম্ভ হইল। মরিচা-ধরা বন্ধ গেট গুলি নতুন রংয়ের নতুন রূপে সাধারণের চক্ষের উপর অচল লৌহ নিষেধের পরিবর্ত্তে সচল মনুষ্য পাহারায় মুক্ত হইল। বিস্মিত জনসাধারণের উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নবনিযুক্ত প্রহরীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

প্রতিদিন মহারাজের বহু প্রজা আসিতে লাগিল—এতদিন পরে নূতন মহারাজ এখানে বাস করিতে আসিতেছেন কিনা জানিতে। কিন্তু সকলেই যখন শুনিল এই পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরবমণ্ডিত প্রাসাদটী মহারাজ কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তিকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন, তখন তাহারা এই স্বেচ্ছাচারী মহারাজের প্রতি একান্ত বিরূপ মন লইয়াই ফিরিতে লাগিল।

এই সংবাদ লইতে সমাগত লোকগুলির নিকট দিন দিন হিরণ খুব প্রিয় ও পরিচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার অসাধারণ সুন্দর আকৃতি আর সকলের সহিত সুমিষ্ট ব্যবহারই ছিল এই জনপ্রিয়তার কারণ।

দেখিতে দেখিতে হিরণের কবি মনের প্রসাধনে প্রাসাদটী যেন উৎসব বেশে সজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সজ্জা দেখিয়া যাহার আগমনের জন্য এই আয়োজন তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে সাধারণের দিনগুলি বেশ আগ্রহেই কাটিতে লাগিল। হিরণের উপর প্রাসাদের সমস্ত ভার দিয়া মিসেস মিত্র বেশ নিশ্চিন্ত মনে সীমার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

হিরণের নিকট উৎসাহ পাইয়া তিনি সীমাকে আর মুরলীবাবুর বাড়ী ফিরিতে দেন নাই।

এতদিন এই সন্তানহীনা বিধবা আপনার অন্তরের পরিপূর্ণ স্নেহ-পাত্রটী লইয়া দানের ব্যগ্রতায় সকল দ্বারেই ঘুরিতেন, এখন যেন অসহায় সীমাকে সংসারের রুক্ষ পথ হইতে তুলিয়া আপনার অতৃপ্ত বক্ষে লইয়া একান্ত স্নেহে সেই পাত্রটী তাহার পরেই উজাড় করিয়া দিতে চাহিতেছিলেন। তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত অনাবশ্যক অর্থ অসঙ্কোচে ব্যয় করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত সীমার বসন ভূষণ প্রভৃতির আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাই প্রতিদিন বহু লোকের আনা-গোনায় বস্ত্র অলঙ্কার বাছাই করিবার ব্যস্ততায় অবসর তাঁর নিতান্ত অল্প হইয়া আসিতেছিল।

এই বস্ত্রালঙ্কারের বাহুল্যতা সীমার একান্ত আপত্তিজনক হইলেও হিরণ প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর আসিয়া সেগুলি সীমার অঙ্গে শোভনতার বিচার করিয়া মিসেস মিত্রকে বেশ উৎসাহ দিতে লাগিল। বিপন্না সীমা কাহাকেও বাধা দিতে পারিল না। মিসেস মিত্রের অন্তরের স্নেহ-মণ্ডিত এই দান ফিরাইয়া দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কিন্তু ইহা গ্রহণের গ্লানিও যেন দিন দিন তাহার বাঞ্ছিতের মিলনানন্দকেও ম্লান করিয়া ফেলিতেছিল।

১৮

প্রাসাদের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

মিসেস মিত্র অনবসরতার জন্য প্রায়ই দেখিতে আসিতে পারেন না। সীমাকে হিরণ প্রতিদিন সঙ্গে করিয়া আনিয়া সব দেখাইয়া তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করে। সেদিনও সীমাকে সঙ্গে লইয়া একটি ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সীমা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল 'কি সুন্দর!'

ঘরের মেঝেটা এমন সুনিপুণ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতেছে যেন একটি নীল সরোবরের স্বচ্ছ জলে কতকগুলি শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

সীমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে বলিল— 'তুমি কবি তাই জানতুম, কিন্তু এ সবও যে তোমার কল্পনায় এমন চমৎকার আসে তা অসিতবাবুর এই ভারটা না নিলে তো জানতেই পারতুম না।'

হিরণ কোমল কণ্ঠে বলিল 'দরিদ্রের অনেক প্রতিভাই যে অপ্রকাশ থাকে সীমা! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য এনে তোমার পায়ের নীচে সাজিয়ে দেবার নেশায় মন আমার দিন রাত মাতাল হয়ে রয়েছে, কিন্তু কতটুকু সামর্থ্য আমার আছে। এরই দুঃখ যে দিন রাত আমায় পীড়ন কচ্ছে।'

বিষণ্ণভাবে কথা কয়টী বলিয়া হিরণ তাহার দুটি চোখের গভীর দৃষ্টি সীমার মুখের পরে ফেলিয়া রাখিল। এই বিষণ্ণ স্বর ম্লান দৃষ্টি সীমাকে কাতর করিল। সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে হিরণের দিকে চহিয়া বলিল—'তুমিও কি

সত্যিই টাকাটাকেই একমাত্র ঐশ্বর্য্য বলে মনে কর ? তুমি কি জান না যখন রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের চাপে অবসন্ন দেহে পথের ওপর তোমার আশ্রয় পেয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম তখন আমাদের মাথার উপর আবরণ ছিল নীল আকাশ, চারিদিকে আড়াল ছিল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির শান্ত স্তব্ধতা, বলো এর চেয়ে সুন্দর জিনিস মানুষ তৈরী করতে পারে কি ? মানুষ শুধু পারে তার মনের কুশ্রীতা দিয়ে এই সৌন্দর্য্যকে কালো করে দিতে। কিন্তু তুমি তোমার মনের অগাধ ঐশ্বর্য্য দিয়ে এই সুন্দরী পৃথিবীর রূপ যে আমার চোখে অপরূপ করে দিয়েছ আরও কত দিতে চাও।'

হিরণ সীমার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল 'জানি সীমা! এই ধূলা-মাটীর সংসারের আলো-বাতাসে মন তোমার তৈরী হয়নি, তাই এই মাটীর বুকে থাকে যে সোনা রূপা তারাও তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে' ভক্ত জানে তার পূজার অসংখ্য আয়োজনে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তবু সে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই যে নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হতে চায়।'

প্রসঙ্গটাকে পরিবর্ত্তনের জন্য সীমা বলিল—'আচ্ছা এই সব এত সুন্দর কত্তে নিশ্চয় খুব খরচ হচ্ছে, কে এত টাকা দিচ্ছে ?'

হিরণ বলিল—'তোমার জ্যেঠা মহাশয়।'

সীমা বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—'জ্যেঠামহাশয় দিচ্ছেন এত টাকা, কেন ?'

হিরণ বলিল—'তিনি দিচ্ছেন মহারাজ দলমীরের টাকা। মহারাজের যে সম্পত্তি তিনি দেখা শোনা করেন তার সমস্ত আয়ের টাকা বিশ বছর ধরে তাঁর কাছে জমা হচ্ছে তার পরিমাণ অনেক, তারই কিছু তাঁর কাছ হইতে নিয়ে এই বাড়ী আমি তৈরী কচ্ছি।'

সীমা তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—'কিন্তু জ্যেঠামশায় শুধু তোমার কথায় এত টাকা দিচ্ছেন।'

হিরণ বলিল—'হ্যাঁ, এটা তাঁর আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ বটে। আমি তাঁকে বুঝিয়েছি যে, মহারাজ চরিত্র হিসাবে যতই খারাপ হোন তবু তিনি একজন মহারাজ, বাড়ীটা অসিতবাবুকে থাকতে দিয়েছেন বলে এতদিনের অসংস্কারের দরুণ ভাঙাচোরা গুলো সারাবার খরচটাও তাঁরই ঘাড়ে চাপানো-টাকে তিনি নিশ্চয়ই অপমানজনক মনে করবেন, এ বিষয় নিজের খেয়াল হয়নি বলেই অসিতবাবুর চিঠিতে কিছু লিখে দেননি; কিন্তু আপনি যদি এখানে উপস্থিত থেকে মহারাজের এত টাকা আপনার কাছে থাকতেও এটা না দেন তো পরে শুনলে তিনি নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন। এখন এই খরচের টাকাটা আমায় দিলে কাজ শেষ করে আমি যে করে হোক মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এই খরচটা মঞ্জুর করিয়ে মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এনে দেব বলে তাঁকে ভরসা দিয়েছি। পর পর আমাকে আর অসিতবাবুকে মহারাজের কাছে থেকে দুখানা চিঠি আদায় কত্তে দেখে এই খেয়ালী মহারাজের অদ্ভুত আচরণের ওপর সকলের আরও আস্থা বেড়ে গেছে, তাই তোমার জ্যেঠামহাশয় আমার কথাটা অবিশ্বাস করে টাকা দেব না বলতে পারেন নি।'

সীমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—'কিন্তু মহারাজ তো সত্যিই ভাল লোক নন, শেষে যদি তোমায় চিঠি না দেন।'

'নিজের অভিজ্ঞতায় না জেনে, কারুকে দোষী বলে বিশ্বাস করাটা কি অবিচার করা নয় সীমা!'

এমন ব্যথা-ভরা কণ্ঠে কথা কটি হিরণ বলিল যে, সীমা আপনার

অসতর্ক কথায় লজ্জিত হইয়া, মহারাজ দলমীর যে হিরণের উপকারী তাহা বিস্মৃত হইয়া হিরণেরই নিকট মহারাজের নিন্দা করিবার অপরাধের অন্যায় বুঝিতে পারিল। হিরণের মন হইতে সমস্ত ব্যথাটুকু মুছিয়া দিবার জন্য কণ্ঠস্বরকে কুণ্ঠা-কাতর করিয়া বলিল—'সত্যিই আমরা সব সময় সকলেই প্রায় এই অন্যায়টা করে ফেলি, অন্যের দোষ দেখবার সময় আমাদের বুদ্ধিটা হয় ঠিক টর্চের আলোর মত এক মুখো, আশে-পাশের অন্ধকারকে আরও গভীর করে এর আলো যেমন একটি জায়গায় পড়ে স্পষ্ট করে তোলে আমাদের চোখে, ঠিক তেমনি করে মানুষকে দোষী ভাববার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও আমাদের বুদ্ধির চারিদিকে আলো বন্ধ করে আলো ফেলে ঠিক সেই অপরাধীর অপরাধ টুকুর ওপর। আমরা তাই দেখতে পাই না ভাবতেপারি না এরই পারিপার্শ্বিকে আরো কত সম্ভাবনাই অদৃশ্য রয়েছে সম্পূর্ণ আলোয় দেখলে যার রূপ ঠিক বিপরীত বলেই হয় তো মনে হবে। কিন্তু তুমি, কত মহৎ, কত সুন্দর!'

সীমার এই অকুণ্ঠ অপরাধ স্বীকার, প্রশংসা, হিরণের দুটি হাস্য-চঞ্চল চোখে যে খুসির আলো সর্বক্ষণ ঝলমল করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। সেই কোমল দুটি চোখের ঘন পল্লবের কোলে কোলে আরও নিবিড় হইয়া উঠিল বিষাদের ম্লানিমা। তাহার দিকে চাহিয়া অনুতপ্তা সীমার সমস্ত অন্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিল সেই ম্লানিমাটুকু মুছিয়া দিবার আগ্রহে।

———

১৯

আর দু'এক দিনের মধ্যেই প্রাসাদের সমস্ত কাজ শেষ হইবে এমন সময় অসিতের আর একখানি পত্র পাইয়া মিসেস মিত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন —অসিত লিখিয়াছে, সে সম্প্রতি মহারাজ দলমীরের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছে তাহাতে মহারাজ তাহাকে লিখিয়াছেন—অসিত যেন প্রাসাদে প্রথম উপস্থিত হইবার দিনে প্রাসাদে একটি ভোজনোৎসবের আয়োজন করে আর সেই আয়োজনটী যেন মহারাজ দলমীরের সম্ভ্রমোচিত অনুষ্ঠানের সহিত হয়, মহারাজ স্বয়ং সেদিন উপস্থিত হইয়া অসিতকে আপনার প্রাসাদে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এই ভোজের সমস্ত ব্যয় ও প্রয়োজনীয় কাজ করিবার জন্য মুরলীবাবুকে মহারাজের লিখিত আর একখানি পত্রও অসিত পাঠাইয়াছিল, তাহার পত্রের সহিত। সেই পত্রখানি মুরলীবাবুকে পাঠাইয়া দিয়া মিসেস মিত্র হিরণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হিরণ আসিয়া সমস্ত শুনিয়া অন্য সব বিষয়ে সে একেবারে অনভিজ্ঞ বলিয়া কেবলমাত্র সেদিন প্রাসাদটিকে উৎসব বেশে সাজাইবার ভার লইয়া মিসেস মিত্রকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিল।

মিসেস মিত্র সীমার বিবাহের আয়োজন উপস্থিত বন্ধ রাখিয়া এই উৎসবটীকে অপূর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাজের আদেশ মত সহরের কোনও বাড়ীই অনিমন্ত্রিত রহিল না।

হিরণ প্রাসাদের বাকী কাজটুকু শেষ করিবার জন্য অসংখ্য লোক

লইয়া দিনরাত পরিশ্রম করিতে লাগিল। প্রাসাদের কাজ শেষ করিয়া রাজ প্রাসাদের উপযোগী দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়া হিরণ যখন এই রূপগৌরবময়ী সুন্দর সৌধটীকে উৎসব-রাত্রে আলোক-মণ্ডিত করিবার আয়োজন আরম্ভ করিল, তখন অসিতের আসিবার মাত্র চারিদিন বাকী।

তখন সহরের সমস্ত বাড়ীতে একটা উগ্র উৎকণ্ঠার আলোড়ন বহিতে-ছিল। সকলেই এই অদ্ভুত কীর্ত্তিপূর্ণ মহারাজ আর তাঁহার এই সমারোহে সম্বর্দ্ধিত অতিথিকে দেখিবার আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত-ঘরের সুন্দরীরা সেদিনের উৎসব-সভায় আপন আপন সৌন্দর্য্যকে চমকপ্রদ করিবার বিবিধ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছোট-বড় সকল ঘরেই এই উৎসবের উদ্দীপনা চলিতে লাগিল।

এমনি অধীরতার মধ্যে আরো দুইদিন কাটিয়া গেল। সমস্ত শেষ করিয়া হিরণ মিসেস মিত্র আর সীমাকে লইয়া আসিল দেখাইতে। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দূর হইতে এই দীপালঙ্কারা সুন্দর প্রাসাদ সীমার চক্ষে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। সে বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'বাঃ এই কি সেই দলমীর প্রাসাদ!'

হিরণ আপনার পরিশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়া কৃতার্থদৃষ্টিতে সীমার দিকে চাহিয়া হাসিল!

মিসেস মিত্র বলিলেন—'হিরণ, এ শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব, অন্যের অসম্ভব বটে।'

হিরণ বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—'আমায় অতটা বাড়িয়ে দেবেন না, এমন অগাধ টাকা পেলে সকলেই এমন করে দিতে পারে।'

মিসেস মিত্র আর সীমাকে সব দেখাইয়া মিত্র-বাড়ী ফিরিয়া হিরণ

মিসেস মিত্রকে বলিল—'সব তো ঠিক হয়েছে দেখলেন, আর তো আমার কোন কাজ নেই, এবার আমি ছুটি নিতে পারি ?'

মিসেস মিত্র বিস্মিত ভাবে বলিলেন—'তার মানে, ছুটি, ছুটি আবার কি ?'

হিরণ হাঁসিয়া বলিল—'ছুটি, মানে ছুটি, কাল একবার সহরে যেতে চাই আমি।'

মিসেস মিত্র উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—'সেকি, কালই অসিত আসবে, মহারাজ আসবেন, কালই উৎসব, কাল তোমার যাওয়া কেমন করে হতে পারে, সে হবে না, অসম্ভব।'

একটু হাঁসিয়া হিরণ বলিল—'কিন্তু না গেলেই যে আমার হবে না। আপনাদের এত বড় উৎসবে আমাকে তো একটু ভদ্র হয়ে বেরুতে হবে, তুমি কি বলো সীমা।'

সীমা কোন উত্তর দিল না, শুধু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিল। মিসেস মিত্র বলিলেন—'বেশ তো, তার জন্যে তোমায় কেন যেতে হবে, কি কি চাই সব লিখে আমার সরকারের হাতে এখনি দিয়ে যাও, সে কাল সব এনে দেবে।'

হিরণ বলিল—'কিন্তু আমার চুলটা দেখছেন, এটা কেটে ছেঁটে ঠিক না করলে কি মহারাজের কাছে বেরুনো যাবে বলে মনে করেন, আর চুলটা কেটে ঠিক করে আনবার জন্যে আমার মাথাও কিছু সরকারের হাতে দিয়ে সহরে পাঠান যাবে না, তাই নিজে না গিয়ে আর উপায় কি বলুন ?'

প্রচ্ছন্ন পরিহাসের গম্ভীর ভঙ্গীতে কথাগুলি হিরণকে বলিতে শুনিয়া

সীমা মৃদু হাসিয়া বলিল—'আচ্ছা মা! এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা কেউই বোধ হয় চুল কাটেন না?'

হিরণই হাঁসিমুখে উত্তর দিল—'কাটেন বৈকি, কিন্তু কাল তো তাঁরা কেউ আর অত বড় মহারাজের কাছে তোমার মত সুন্দরীর ভাবী স্বামী বলে পরিচয় দেবেন না, তাই তাদের সবই চলে যাবে, কিন্তু আমার অবস্থাটা যে বিশেষ সুবিধার নয়, সেটা তুমিই ভেবে দেখ না একটু।'

সীমা লজ্জিত হাস্যে মুখ ফিরাইয়া লইল। মিসেস মিত্র নিরুপায় হইয়া হিরণকে মত দিলেন। তাঁহার নিকট বার বার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া হিরণ বিদায় লইল।



২০

পরের দিন সকালেই অসিত আসিয়া পৌঁছিল। মিসেস মিত্র সীমার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া আপনার অসংখ্য কাজের তাগিদে চলিয়া গেলেন। অসিত পূর্ব্ব পরিচিতের মত সীমার সহিত অসঙ্কোচ ভাবে অবিরাম কথা বলিতে লাগিল। এই শিশুর মত সরল চঞ্চল প্রিয়দর্শন যুবকটীকে সীমার বেশ ভালই লাগিতেছিল। সে প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে অসিতের অসংখ্য অসংলগ্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। তাহার অধিকাংশগুলিই হিরণকে লইয়া। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বোধ হয় শতবার সীমাকে বলিল—সে হিরণকে দেখিবার জন্য কত ব্যগ্র, আর আজই হিরণের সহরে যাওয়া কত অন্যায়।

বাক্-প্রিয় অসিতের অভ্যাস মিসেস মিত্র ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই একটু পরে আসিয়া তাহাকে স্নানাহারের তাগিদ দিয়া তুলিয়া দিয়া গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে স্নানাহার সারিয়া অসিত মিসেস মিত্রকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল—দলমীর প্রাসাদ দেখিবার অধীর আগ্রহে মিসেস মিত্র যথা-সম্ভব শীঘ্র কাজগুলি শেষ করিয়া সীমাকে সেদিনের উৎসবের উপযোগী করিয়া সাজাইবার জন্য আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি বাহির করিয়া সাজাইতে বসিলেন। সজ্জা শেষ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সীমাকে দেখিতে দেখিতে তাহার মুখখানি ম্লান দেখিয়া নিকটে আসিয়া তাহাকে বক্ষের নিকট টানিয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—'মুখখানি এমন শুকনো করে আছো কেন সীমা! আমার বাক্স-ভরা এই গহনা

কাপড় গুলো এতদিন পড়েই ছিলো, দেখতুম আর ভাবতুম এ গুলো কি হবে, এমন সার্থক যে এ গুলো হবে সীমা এ তো কোনও দিন ভাবতেও পারিনি। তুমি এতে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন? আমি তোমার সত্যিই মা নই বলে; তোমার নিজের মা হলে তো কোনও দোষ তোমার মনে স্থান পেত না সীমা।'

সীমা অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'না, দোষ মনে করিনে মা! এত ভাল ভাল জিনিষ আমায় মানায় না, তাই লজ্জা করে।'

মিসেস মিত্র বলিলেন—'এর চেয়ে ভাল কাকে যে মানায় তা তো জানি না সীমা।.........'

মিসেস মিত্রের কথা শেষ হইবার আগেই অসিত ঘরে ঢুকিয়া সীমাকে দেখিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'বাঃ! কি সুন্দর মানিয়েছে, তুমি যে এমন সুন্দর সাজাতে পার তা তো জানতুম না পিসিমা! আজকের ভোজে মহারাজের সামনে যদি সুন্দরীদের একটা কম্‌পিটিসন হোত, তা হলে আপনিই নিশ্চয় জিতে যেতেন মিস রায়!'

লজ্জারক্ত সীমা অসিতের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে ইহারই মধ্যে নিজের সুন্দর দেহটীকে বেশ মূল্যবান্ উৎসবোপযোগী বেশে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে।

মিসেস মিত্রের দিকে চাহিয়া অসিত তখন বলিতেছিল—'তোমার তো এখনও কাপড় বদলান হয়নি দেখছি। দোহাই তোমার পিসিমা! নাও একটু শীগ্‌গার করে সব সেরে, তোমরা নিজেরা সব দেখেছ কিনা তাই বুঝতে পাচ্ছ না সেই সুন্দর দলমীর প্রাসাদ হিরণ বাবুর সাজানতে আরো কত সুন্দর হয়েছে দেখবার জন্যে আমি কি রকম ব্যস্ত হয়েছি।'

সীমা।

মিসেস মিত্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'দেখলেই তো ফুরিয়ে গেল। তোর মত এমনই আগ্রহ নিয়ে দেখাই তো আনন্দ রে। যতক্ষণ আগ্রহ থাকে ততক্ষণই ভাল।'

কথা কয়টী বলিয়া মিসেস মিত্র বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার গাড়ী সকলকে লইয়া দলমীর প্রাসাদ অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

———

২১

ক্রমে সেই বহুজনের প্রতীক্ষিত উৎসব-সন্ধ্যা সমাগত হইল। দলমীর প্রাসাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ঘরখানি শোভন সজ্জার অপরূপ সৌন্দর্য্যে অসীম ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি নিয়ে নিমন্ত্রিতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত ছিল। সহরের সকল ঘরের সুন্দরীরা কেশে বেশে নতুনত্ব লইয়া নতুন মহারাজের দর্শন-কামনায় সমবেত হইতে লাগিলেন।

অসিত মিসেস মিত্রের মধ্যস্থতায় সকলের সহিত একে একে পরিচিত হইয়া মহারাজের বিষয়ে অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বিব্রত হইয়া পড়িল।

মিসেস মিত্র স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত সকলকেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত স্ত্রী-পুরুষে ঘরখানি প্রায় ভরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু হিরণ সহর হইতে ফিরিল না দেখিয়া মিসেস মিত্র মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কয়েকটী নিমন্ত্রণে যাঁহারা হিরণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন আজিকার এই উৎসবটী যাঁহার কল্পনায় এমন সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার সুমিষ্ট হাসির সংযোগ না হইলে ইহা তাঁহাদের তেমন উপভোগ্য হইবে না।

সীমাও চিন্তাকুল চিত্তে একপাশে বসিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা তাহাকে যেন সম্রাজ্ঞীর ন্যায় মহীয়সী মনে

হইতেছিল। সেই ঈষৎ চিন্তা ম্লান মুখে এমন মহিমময় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে সকলের মুগ্ধদৃষ্টি বার বার তাহারই পরে স্থির হইতেছিল।

সম্ভ্রান্ত ঘরের সমাগত তরুণেরা তাহার দিকে চাহিয়া নগণ্য হিরণের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িতেছিল। অসিত বার বার তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে হিরণের বিলম্বের অনুযোগ করিয়া যাইতেছিল। হিরণের এই বিলম্ব সীমার মনে এক আশঙ্কার কাঁপন তুলিয়া তাহাকে ক্রমে অবসন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল।

নিমন্ত্রিতেরা সকলেই বার বার ঘড়ি দেখিয়া মহারাজের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মিসেস মিত্র হিরণের জন্য উৎকণ্ঠিত চিন্তা গোপন করিয়া প্রশান্ত হাস্যে সকলের সঙ্গেই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় মুরলীবাবু আর সরোজিনী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মিসেস মিত্র অগ্রসর হইয়া অনুযোগের স্বরে বলিলেন—'এত দেরী করে আসতে হয় সরোজিনী! এ তো তোমাদেরই কাজ।'

ক্লান্তস্বরে সরোজিনী বলিলেন—'শরীর আজ খুবই খারাপ, মহারাজ আসবেন তাই আজ না এসে পারলুম না।'

মিসেস মিত্র তাহাদের বসাইয়া দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। সরোজিনী চারিদিকে চাহিয়া হিরণকে না দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ ফিরাইতেই চোখ পড়িল হীরকভূষণা সীমার প্রতি। তাহার অলঙ্কারের সব জ্যোতিটুকু জ্বলিয়া উঠিল সরোজিনীর মনে। তিনি চোখ ফিরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন 'আহা সত্যিকারের রাণী-গিরিতে লাথি মেরে হা ঘরের বউ হতে গেলেন। এমন ধার করা গহনা পরে রাণী সাজতে লজ্জাও নেই। বেহায়া ছুঁড়ি বসে আছে দেখ না।'

২২

উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া সীমা বাহিরে আসিতেই একজন দাসী আসিয়া বলিল হিরণ তাহাকে ডাকিতেছে। আনন্দে সীমার সমস্ত মন নিমেষে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে দাসীর নির্দ্দেশিত ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। হিরণ চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহে বিলাস পারিপাট্য ভরা বহু মূল্য সজ্জা এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে মুগ্ধ সীমা বিস্মিত হইয়া ভাবিল এ সৌন্দর্য্য কি মর্ত্তবাসী নরদেহের। সীমাকে দেখিয়াই হিরণ তাহার দিকে অগ্রসর হইতে বলিল—'একি সীমা! একি সাজ, এ তো গরীব হিরণের উপযুক্ত নয়, এ বেশে তোমায় আজ দেখে সবাই মহারাণী দলমীর বলে ভুল করবে যে।'

সীমা লজ্জিত হাঁসির সঙ্গে বলিল—'কি সব যা তা বোলছ, এত দেরী করলে কেন? সবাই তোমার কথা বলছেন, চলো ও ঘরে।' হিরণ সীমার হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিজে আর একখানি চেয়ার লইয়া তাহার নিকটে বসিতে বসিতে বলিল—'বসো যাচ্ছি একটু পরে, দেখ তো সাজটা কেমন হয়েছে তোমাদের এই উৎসবে উপস্থিত হবার মত তো?'

সীমা একটু হাসিয়া হিরণের অল্প আগের পরিহাসটী তাহাকেই ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল—'এত ভাল হয়েছে যে এখনই হয় তো অচেনারা তোমায় মহারাজ দলমীর বলে ভুল করবে।'

হিরণ তার সমুদ্রের মত নীলাভ অতল রহস্যময় দুটী চোখের দৃষ্টি সীমার মুখের পরে ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, সেই দৃষ্টির অচেনা স্পর্শ সীমা সহ্য করিতে পারিল না ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

হিরণ বলিল—'আমার দিকে চাও সীমা! শোন, আচ্ছা সত্যিই যদি আমি এখন মহারাজ দলমীর হয়ে যাই কি করো তুমি? রাজা বিনয়েন্দ্রের মতো আমাকেও ত্যাগ করে যাও।' হিরণের মুখের কথা-গুলিতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের আভাষ ছিল যে সীমার মন একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল সে বলিল 'আজ বার বার কি সব বোলছ বলতো, চলো এখন ও ঘরে যাই সবাই তোমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।'

হিরণ সীমার হাত দুখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—'সত্যি সীমা এখনই আমার বড় জানতে ইচ্ছা করছে, তোমার যে ভালবাসা আজ হিরণকে ঘিরে আছে, সেই হিরণ যদি কখন ও তোমার কল্পনার অতীত রূপে বদলে যায়, বলো, তুমি তখনও কি তাকে এমনই ভালবাসবে? পৃথিবীর কোনও পরিবর্ত্তন কোনও বাধা কি তোমার মন থেকে আমায় সরিয়ে দিতে পারবে না?' সীমা নিরুত্তরে শুধু আপনার দৃষ্টিটুকু হিরণের দৃষ্টির পরে তুলিয়া ধরিল। সেই মুগ্ধ দৃষ্টির ভাষা হিরণ বুঝিত, তবু আজ সে তাহাতে তৃপ্ত হইল না। ব্যগ্র স্বর অনুনয়ে ভরিয়া বলিল—'জানি সীমা! জানি, তোমার ওই দৃষ্টি প্রতিদিন আমায় অনেক আশা দিয়েছে, তবু আজ আমি তোমার মুখে শুনতে চাই সীমা! কোন দিন কোনও কারণে ওই দৃষ্টিটুকু আমার ওপর থেকে ফিরিয়ে নেবে না। যাই হই আমি, তুমি চিরদিন তোমার ভালবাসা দিয়ে আমায় এমনি করে ভরিয়ে রাখবে, বলো সীমা!'

সীমা ধীরে ধীরে বলিল—'আজও এত সংশয় কেন? তোমাকে আজ কেমন করে বোঝাবো আমি, তোমার মধ্যে কেমন করে নিজেকে হারিয়েছি।'

সীমার হাত দুখানি আপনার হাতের মধ্যে ধরিয়া হিরণ একটু চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত দুখানি ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'তুমি যাও সীমা! আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

সীমা একটু বিষণ্ণভাবে তাহার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

অল্প পরে বসিবার ঘরের দরজার ভারী পর্দা দুহাতে সরাইয়া হিরণ ঘরে ঢুকিতেই অসিত সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'মহারাজ দলবীর'।

সমস্ত ঘরে যেন বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সীমা একটা খোলা জানলার নিকট দাঁড়াইয়াছিল একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। মহারাজের দৃষ্টি তাহারই পরে স্থির ছিল তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া বিস্মিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনারা একটু ক্ষণ আমায় ক্ষমা করুন, আমি এঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে আনি।'

মহারাজের কথায় অনেকেই তাহাকে সাহায্যের জন্য আসিল। সকলকেই সুমিষ্ট হাসির সহিত অনাবশ্যকতা জানাইয়া দুই বলিষ্ঠ বাহুর উপর সীমার সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া মহারাজ বাহির হইয়া গেলেন।

———

২৩

ঘরে একটা আশ্চর্য্য আলোচনার স্রোত বহিল। নির্জ্জন ঘরে মহারাজের শুশ্রূষায় শীঘ্রই সীমা চোখ মেলিয়া চাহিল। পাশেই উদ্বেগ-কাতর মুখ মহারাজকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শয্যায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাঁদছো কেন সীমা।'

সীমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'তুমি, তুমি মহারাজ দলমীর নারী-পীড়ক ! হত্যাকারী ! চরিত্রহীন।'

অধীর কান্নায় সীমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। মহারাজ ধীর-স্বরে বলিলেন—'মুখ তোল সীমা ! ভাল করে চেয়ে দেখ, যে সব কথা বল্লে আমায়, আমার মুখে তার কোন চিহ্ন আছে কিনা, দেখ সীমা, আমার চোখে এমন কিছু নেই যাতে আমার এই সব কলঙ্কের কথা তোমার মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। সীমা কোনই উত্তর দিল না। সেই একই ভাবে কাঁদিতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগে তাহার সকল দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মহারাজ নত হইয়া তাহার মুখের নিকট সরিয়া গিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—'তোমার এই অবিশ্বাস যে আমায় কি যন্ত্রণা দিচ্ছে, তুমি তোমার ভালবাসা দিয়ে তা কি অনুভব কত্তে পাচ্ছ না সীমা।'

কোনই উত্তর নাই, শুধু সীমার অসহ্য বেদনার অস্ফুট কান্নার সংযত স্বর মহারাজকে অধীর চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি দুই

হাতে সীমাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনার দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া করুণ মিনতিমাখা কণ্ঠে বলিলেন—'সীমা! মিথ্যা জনরব বিশ্বাস করে তুমি আমার সারা জীবনের সাধনাকে মিথ্যা করে, আমার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে। বলো সীমা! এত বড় শাস্তি অকারণে তোমার হাত থেকে আমায় পেতে হবে। আমাকে শাস্তি দেবার আগে তুমি কি একবার জানতেও চাও না কথাগুলো সত্যি কিনা, সত্যি আমি অপরাধী কিনা।'

এইবার সীমা অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'তোমাকে শাস্তি দেবার শক্তিও যে আমি তোমার মধ্যেই হারিয়ে ফেলেছি। তোমায় অবিশ্বাস করে আমি কেমন করে বেঁচে থাকবো।'

মহারাজ সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—'আমায় বিশ্বাস করো সীমা! তোমার এ ভালবাসার অযোগ্য কলঙ্কে আমি নিজকে কখনও লিপ্ত করে ফেলিনি। আমার প্রেমের অম্লান শতদল শুধু তোমার স্পর্শেই গন্ধে বর্ণে আমার সমস্ত মন পরিপুর্ণ করে তুলেছে। তুমিই আমার জীবনে একমাত্র নারী সীমা।'

সহস্র স্বান্ত্বনায় সীমাকে শান্ত করিয়া তাহাকে লইয়া মহারাজ সকলের নিকট ফিরিয়া আসিতেই চারিদিকে ব্যগ্র অভিবাদন ও পরিচয়ের ত্বরা পড়িয়া গেল। সীমা ধীরে ধীরে গিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল। তাহার বিষণ্ণ মুখ সকলকেই বিস্মিত করিল। মহারাজের ব্যগ্র দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মুখের পরেই স্থির হইতে লাগিল। সকলের সহিত পরিচয়ের ব্যস্ততা কমিলে মহারাজ মিসেস মিত্রের নিকট আসিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন—'আমি কিন্তু আপনার কাছে হিরণই থাকতে চাই।'

মিসেস মিত্র সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—'নিশ্চয়, হিরণ আমার মহারাজদের চেয়ে ঢের ভাল ছেলে।'

মহারাজ একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—'আপনার সীমারও যে সেই বিশ্বাস, সে যে মহারাজকে ভয় দেখায়।'

মিসেস মিত্র বলিলেন—'হিরণের কুশলতার ওপর আমার ভয়ানক বিশ্বাস আছে মহারাজার কোনও ভয় নেই।' সরোজিনীকে বিবর্ণমুখে একপাশে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাজ তাঁহার নিকটে গিয়া হাসিমুখে বলিলেন—'সীমার জন্যে এখন আর আপনার কোন দুঃখ নেই নিশ্চয়? সরোজিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ক্ষমা করবেন. তখন তো আপনাকে—'

মহারাজ বলিলেন—'ক্ষমা বলবেন না। সীমার সম্বন্ধে এখন আপনাদের আমার সম্মান করাই উচিত। আর তখন তো আপনি বিশেষ অন্যায় কিছু করেন নি, সীমার মঙ্গল ভেবে যা কিছু করেছিলেন তা এমন কিছু অন্যায় নয়।'

এক পাশে বিমর্ষভাবে অসিত বসিয়াছিল মহারাজ তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—'তুমি এত বিষণ্ণ কেন? তুমিই হ'লে আজকের উৎসবের উৎস, তোমার জন্যেই সীমাকে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তোমার কথা শুনে দলমীর দেখবার ইচ্ছে যদি আমার না হোত তা হ'লে আমার সমস্ত কল্পনা দিয়ে যাকে গড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তাকে এখানে সমুদ্রের ধারে সজীব প্রতিমায় দেখতে পেতুম না। আমি সারা জীবন কল্পনা নিয়েই ঘুরে বেড়াতুম, আর সীমা এখানে রাজা বিনয়েন্দ্রের রাণী হয়ে সুখে বাস করতো। তুমিই আমার এ সৌভাগ্য এনে দিয়েছ বন্ধু, তুমি

আনন্দ করো।'

অসিত উঠিয়া অপ্রস্তুত ভাবে বলিল—'আমার কাছে শুনে এমন ইচ্ছা আপনার হ'তে পারে এ আমি ভাবতেও পারিনি।' এই সময় মুরলীবাবুও অগ্রসর হইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—'আপনিই যে মহারাজ এ আমরা কল্পনাও কত্তে পারিনি আমরা কত'......

বাধা দিয়া মহারাজ হাসির সহিত বলিলেন—'কিছুই করেন নি আপনারা সকলেই আমার খুব সম্মান করেছেন, আর সেই হচ্ছে আমার সত্যিকারের প্রাপ্য। মহারাজকে মান্য তো সব সময়েই করে থাকে লোকে।'

তাহার পর মহারাজ দু'একটা কথায় সকলকেই আপ্যায়িত করিতেই রাত্রি অনেক হইয়া গেল। একে একে সকলেই বিদায় লইয়া মহারাজের সৌজন্যের আর সীমার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল।

২৪

ছোট দলমীর সহরটীকে আনন্দ-প্লাবিত করিয়া অজস্র অর্থ আর অনিন্দ্য ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, মহারাজ দলমীর সীমাকে মহারাণী দলমীরের যে আসন এতদিন বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরীদের একান্ত কামনার ছিল তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এতদিন আপনার মানসীকে রক্ত-মাংসের নারীরূপে পাইতে চাহিয়া অসংখ্য নারীর মনে যে আশা-ভঙ্গের আঘাত দিয়া আপনার মনেও গভীর বেদনা পাইয়া ফিরিতে ছিলেন, এখন এই মর্ত্ত্য-মানবীকে দেবীর আরাধনায় আপনার সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া মনকে তাহার গ্লানি মুক্ত করিতে চাহিলেন। তাই তাহার অজস্র উপকরণ আহরণ করিয়া বাঞ্ছিতাকে বিস্মিত করিয়া দিবার ইচ্ছায় ধনী বিলাসীদের বিলাসের ক্ষেত্র বোম্বাই লইয়া গেলেন।

এই সহরের অভিজাত সম্প্রদায় মহারাজকে একটা বিশেষ চক্ষে দেখিত। কিছুদিন আগে এই কুমার তরুণ মহারাজ ইহাদের সকলের আরাধনা আর আলোচনার বস্তু ছিলেন।

যে জনরব দলমমীরের অধিবাসীদের মন মহারাজের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল, মহারাজের সেই কাহিনী কিছুদিন এখানে ও সকলের মুখে মুখে ফিরিয়া ছিল। কিন্তু মহারাজের ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে এই সমাজে একটুও প্রতিপত্তিহীন করিয়া দেয় নাই। সকল সময় সকল স্থানেই তাঁহার আগমন একটা আনন্দের মধ্যেই অভিনন্দিত হইয়া উঠিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে গড়া এই সমাজের সুন্দরীরা কোন সম্মিলনী বা উৎসব আমন্ত্রণে উপস্থিত হইবার সময় এই নারীরূপ বিশ্লেষণকারী সুবেশ মহারাজটীর উপস্থিতি স্মরণ করিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আপনাদের শোভন করিয়া তুলিতেন।

কোন কুমারী আপনার সৌন্দর্য্যে মহারাজের কবি-দৃষ্টিতে ঈষৎ মুগ্ধতার আভাষ দেখিতে পাইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। অনেক সময় নারীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশের মহারাজের নিজস্ব আনুগত্য পূর্ণ কোমল ভাবটিকেই তাহারা আপনার আশার রংয়ে রূপ দিয়া কল্পনায় আত্মহারা হইত। পরে আবার কোনও রমণীর সহিত মহারাজকে ঠিক তেমনিই সম্ভ্রম-সুন্দর বিনীত ব্যবহার করিতে দেখিয়া অকারণ ঈর্ষায় ইহাকে মহারাজের চরিত্রহীনতারই ভদ্র আবরণ বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না। এমনি করিয়া অকারণ কলঙ্কের বোঝা মহারাজের নামের পশ্চাতে দিনের পর দিন জমা হইয়া উঠিলেও, তাঁহার সর্ব্ব-মাধুর্য্যের অসাধারণ আকর্ষণও কোনও নারী অনুভব না করিয়া পারিত না। কিছুদিন ধরিয়া বোম্বাইয়ের এই সমাজ মহারাজের কোনও সন্ধান না পাইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় মহারাজের এই উপস্থিতির নতুনত্ব সকলের মনে একটা কৌতূহল সৃষ্টি করিল। সকলেই সবিস্ময়ে বলিতে লাগিল—কেমন এই নারী! যে এতদিন পরে এই পরশ্রী রাজার গর্ব্বিত মনে পরাজয়ের দাবীতে মহারাণীর আসন অধিকার করিল প্রতিদিন তাই এই শক্তিময়ী নারীকে দেখিবার দুর্নিবার আগ্রহ লইয়া সকলে মহারাজের দ্বারে আসিয়া ফিরিতে লাগিল। মহারাজ মহা সতর্কে তাঁদের নিভৃত কুঞ্জের দ্বার

এই সব উৎসুক জনতার সম্মুখে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। 'মহারাজ অসুস্থ দেখা হইবে না' এই একটীমাত্র কথা শুনিয়াই সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিল। সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া কেহই যখন এই বিস্ময়কারিণী মহারাণীর দেখা পাইল না, তখন একটা অসন্তুষ্ট আন্দোলনে সমস্ত সহরটা তাহারা উদ্বেল করিয়া তুলিল।

সহরের সেরা বস্ত্রালঙ্কার ব্যবসায়ীদের নিকট সহরের ধনী গৃহের বিলাসিনীরা সংবাদ পাইলেন, তাহাদের সকলের নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষগুলি লইয়া মহারাজ এই বিজয়িনীর সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। অধীর কৌতূহলে এই সুন্দরীরা অবশেষে মহারাণী ধারপুরের শরণাপন্না হইলেন।

এই মহারাণী ছিলেন এই সমাজের সেরা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা বলিয়া সকলের নিকট সম্মানিতা। সমস্ত সমাজের উপর এর প্রভাব ছিল অসাধারণ। অনেক তরুণ ধনকুবের এই মহারাণীর একটু হাসির বিনিময়ে আপনার অনেক কিছু ক্ষতি করিতে পারাটাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বিধাতার বিধানে এই অসামান্য নারীর জীবনেও একদিন প্রত্যাখ্যানের আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই অগ্নি ধূমাচ্ছন্ন নয়নে সেদিন ইনি বিগতযৌবন বিপত্নীক মহারাজ ধারপুরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আজিও সেই অগ্নিকণা গোপনে তাঁহার অন্তর দগ্ধ করে কি না কে বলিতে পারে। বাহিরে তিনি পদোচিত মহিমার স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সকলকেই মুগ্ধ করিতেন।

মহারাজের এই নিভৃত বাস মহারাণী ধারপুরের মনে কোনও বিগত দিনের স্মরণ বেদনা জাগাইল কি না কে জানে। তিনি

মহারাজের প্রেম-কুঞ্জে প্রবেশ করিতে স্বীকার করিয়া সকলকে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু পরদিন প্রতিজনের মত তাঁহার গাড়ীও মহারাজ দলমীরের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। দ্বারবানেরা মহারাণীর মর্য্যাদা বুঝিল না। প্রতিজনের মত তাহাকেও ফিরাইয়া দিল।



২৫

মহারাণী ধারপুর ফিরিয়া যাইবার পরদিন সকালে মহারাজ দলমীর সীমার সহিত তাহার বসিবার ঘরে একখানি সোফার উপর বসিয়া গত দিনের দর্শনপ্রার্থীদের পরিচয় পত্রগুলি পড়িতে ছিলেন। মহারাণী ধারপুরের পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'একি ইনিও এসেছিলেন নাকি, এঁকে ফিরিয়ে দিয়ে মুস্কিল করেছে দেখছি।'

সীমা মহারাজের কথায় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেন? কে ইনি।'

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'ইনি আমাদের সকলের চেয়ে বড় মহারাজ ধারপুরের মহারাণী, এখানকার সব চেয়ে ধনী মাণিক-জীর মেয়ে, রূপে গুণে, সমাজের সেরা বলে সকলের কাছে এঁর খুব সম্মান। দুঃখের বিষয় সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এঁর থাকলেও ইনি বিগতযৌবন মহারাজকেই বিয়ে করলেন।'

সীমা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—'কেন করলে? মহারাজ সম্মানে সবার বড় বলে।'

মহারাজ তাঁর কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু দুটীর দৃষ্টি সীমার মুখের পরে রাখিয়া বলিলেন—'না, কোনও যুবক মহারাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে।'

মহারাজের সেই দৃষ্টির মধ্যে সীমা অনেক অজানার আভাষ

পাইয়া আপনার মধ্যে একটা অকারণ লজ্জা অনুভব করিল। মহারাজ সীমার দিকে আরও একটু সরিয়া তাহার পিঠের উপর এক খানি হাত রাখিয়া বলিলেন—'সীমা! এইবার বোধ হয় আমাদের এই দুজনের—জগতে অবারিত জনতার আগমন অনিবার্য্য হবে।' সীমা শঙ্কাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'কেন?'

মহারাজ বলিলেন—'এই মহারাণীকে ফিরিয়ে দিয়ে যে অপমান করেছি আমরা, তার জন্যে তাঁর কাছে গিয়ে যদি আমরা ক্ষমা না চাই তা হ'লে এতদিন ধরে যাদের আমরা দেখা না করে ফিরিয়ে দিয়েছি, তারা এই মহারাণীর অপমানকে উপলক্ষ্য করে আমাদের উপর তাদের সকলের অপমানের শোধ তুলবে। এই মহারাণীর কথায় তারা কত্তে পারবে না এমন কোন কাজ নেই। আমি একা হলে ভয় পেতুম না; কিন্তু এবার যে তুমি আছ সীমা! তাই মহারাণীকে সম্মান দিতে আমাদের যেতে হবে মহারাণীর কাছে, আর তাঁর কাছে যাওয়া মানেই সমস্ত বোম্বাইয়ের সমালোচ্য হওয়া।'

সীমার মুখের বিবর্ণতা দেখিয়া মহারাজ কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু তোমার ভাল না লাগে তো যাব না সীমা! চলো আমরা আজই এখান থেকে চলে যাই, এখানকার ভয় ভাবনা এখানেই পড়ে থাক, আমরা আর এখানে আসব না।'

সীমা আপনাকে সংযত করিয়া শান্ত নির্ভর-ভরা দৃষ্টিতে মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'না; তুমি কাছে থাকলে আমার কোথাও ভয় করবে না।'

সেই সুন্দর দুটি চোখের পানে চাহিয়া মহারাজ ভাবিলেন—এই নির্জ্জন বনে ফুটিয়া ওঠা সুরভিময় ফুলটি বুকে পরিয়া কেন এই পথের জনতায় পা দিয়েছিলাম।

২৬

পরদিন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় মহারাজ দলমীরের সুদৃশ্য গাড়ীখানি বিস্মিত দর্শকের দৃষ্টির উপর দিয়া দীর্ঘপথ বাহিয়া, মহারাণী ধারপুরের প্রাসাদের সম্মুখস্থ পুষ্পপ্রচুর উদ্যানের প্রশস্ত কঙ্করময় পথটা পার হইয়া প্রশস্ত সিঁড়ির নিকট থামিল।

মহারাজ ধারপুরের মর্য্যাদার অনুরূপ জমকালো পোষাকধারী দ্বারবান ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহারাজ দলমীর নিজে নামিয়া সযত্নে সীমাকে নামিবার সাহায্য করিয়া, সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলেন। সম্মুখের সুদীর্ঘ দালানটী মহারাণীর দর্শনপ্রার্থীর ভিড়ে ভরা। সপ্তাহে এই একটি মাত্র দিনই ছিল মহারাণী ধারপুরের অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট; তাই এই দিনটী সহরের সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমাগমে মহারাজ ধারপুরের পরিচালকমণ্ডলীর নিঃশ্বাস ফেলিবারও নিশ্চিন্ত অবকাশ মিলিত না। প্রভাতের প্রথম কয়েক ঘণ্টা ছিল মহারাণীর সমপদস্থ প্রিয় বান্ধবদের জন্যেই নির্দ্দিষ্ট; তাই অন্য যাহারা অগ্রে আসিত তাহাদের অপেক্ষার জন্য এই সুসজ্জিত দালানটিই ছিল নির্দ্দিষ্ট। বিশিষ্টের প্রতি ব্যবহার মহারাণীর সুশিক্ষিত ভৃত্যেরা ভাল রকমই জানিত, তাই সুপরিচিত মহারাজকে লইয়া চলিল মহারাণীর সাক্ষাত-কক্ষে। তাহার সম্মুখের দ্বারে বহুমূল্য নীল পর্দ্দার

সম্মুখেই মহারাণীর প্রধানা পরিচারিকা দাঁড়াইয়াছিল। অভ্যাগতদের নাম ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া তাহার গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই মহারাণীকে জানাইবার প্রথা ছিল।

মহারাজ দলমীর সীমার হাত ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার বিস্মিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—'মহারাজ আর মহারাণী দলমীর' গৃহের মধ্যে তখন একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছিল। মহারাজ সীমাকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলেই নির্ব্বাক্ ক্ষণবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এইমাত্র যাহাদের লইয়া কত অসম্ভব জল্পনা চলিতেছিল তাহাদেরই অতর্কিত উপস্থিতিতে সকলেই যেন কিছুকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মহারাজ দলমীর সীমার মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া তাহাকে লইয়া মহারাণী ধারপুরের নিকট গিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিলেন—'মহারাণী দয়া করে আমায় অনুমতি দিন, মহারাণী দলমীরকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার।'

মহারাণী ধারপুর বলিলেন—'তার আগে মহারাণীকে এখানে বসাও দলমীর! আমায় একটু সময় দাও, এমন অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করে, প্রকৃতিস্থ হতে আমার সময় লাগবে।' মহারাজ দলমীর তাঁর অভ্যস্ত মিষ্ট হাসির সঙ্গে উত্তর দিলেন—'কিন্তু আমি জানি মহারাণীর অপরাধীকে ক্ষমা করবার উদারতা অসাধারণ, তাই কোন অবস্থাতেই তিনি অপ্রকৃতিস্থা হন না।'

মহারাণী ধারপুর হাসিয়া বলিলেন—'আমিও জানি, দলমীর বাক্-চাতুর্য্যে অসাধারণ। মহারাণীকে বসাও দলমীর।'

মহারাণী ধারপুর আপনার আসনখানিরই অপর অংশ সীমার জন্য

নির্দ্দেশ করিয়া দিতে, মহারাজ দলমীর প্রথামত সীমার সহিত পরিচয় করাইয়া সীমাকে সেখানে বসাইয়া আপনি অল্প একটু দূরে গিয়া বসিয়া, মহারাণী ধারপুরের আশে-পাশে উপবিষ্ট তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিতদের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি সীমার মুখের পরেই স্থির। মহারাজ ঈষৎ চিন্তিত-চঞ্চল মনে সীমার দিকে চাহিলেন। সীমা তখন মহারাণী দলমীরের উপযোগী সুশিক্ষিত শোভন সাবলীল ভঙ্গীর সহজ অকুণ্ঠিত আলাপে মহারাণী ধারপুরের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। মহারাজের কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব প্রসাধন সেদিন সীমাকে তাহার সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোচ্চ মাধুর্য্য মাখাইয়াছিল। সীমাকে এই আচারপ্রিয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মুখীন করিবার সময় তাহার লজ্জিত মৃদু স্বভাবের জন্য মহারাজ মনে যে অকথিত আশঙ্কা বহন করিতেছিলেন, এই মহিমময়ী সীমার দিকে চাহিয়া তাহা তাঁহার মন হইতে নিঃশেষে নামিয়া গেল। তিনি মুগ্ধ অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি শুনিলেন—মহারাণী ধারপুর বলিতেছেন—'আমাদের এই সমাজের এমন কোনও মেয়ে নেই যে দলমীরকে বন্দী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা না করেছে, কিন্তু কেউ ওই প্রজাপতির পাখা কাট্‌তে পারেনি। প্রত্যেক ফুল পরখ করেই ও দিন কাটিয়েছে, তুমি কেমন করে ওকে বন্দী করলে তাই শোনবার আগ্রহে এরা আরো তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল।'

কথা কটি মহারাজের কাণে গিয়া তাহার শুভ্র নিটোল ললাটে ঈষৎ চিন্তার চিহ্ন ফুটাইয়া তুলিল। তিনি সীমার উত্তর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব

হইলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে সীমা উত্তর দিল—'কিন্তু আমি তাঁদের এ আগ্রহ তো মেটাতে পারবো না, আমি তো মহারাজের প্রজাপতি রূপ দেখিনি, আমার কাছে এসেছেন তিনি দেবতার সৌন্দর্য্য নিয়ে, ফুল তাই তাঁর পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পেয়ে ধন্য হয়ে গ্যাছে।'

বিশ্বের সমস্ত সুখ যেন মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজের মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। চকিতের জন্য আত্মবিস্মৃত মহারাজ আবার শুনিতে লাগিলেন মহারাণী ধারপুর সীমার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া কোমল-ভাবে নাড়া দিতে দিতে বলিলেন—'ওঃ! ঠিক দলমীরের যোগ্যাই তুষ্ট তুমি, আচ্ছা এখন অনুমতি দাও তোমাকে ওদের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার।'

সীমা বলিল—'আনন্দের সঙ্গে বলছি মহারাণী, ওঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেলে আমিও খুব সুখী হবো।'

মহারাণী ধারপুর বলিলেন—'কিন্তু এতদিন আমাদের ঠিক এর উল্টো ধারণাই ছিল।'

সীমা হাসিয়া বলিল—'দেখুন প্রত্যেকের জীবনেই তো এমন একটা দিন আসে যখন তারা দুজনে একলা থাকতে চায়, সেইটে স্মরণ করেও আপনাদের ক্ষমা করা উচিত আমাদের।'

মহারাণী ধারপুর সহাস্যে বলিলেন—'আশা করি সুন্দরী মহারাণীর জীবনের সেই দিনটী এত শীঘ্রই শেষ হয় নি।'

সীমা শুধু সুমিষ্ট হাসি দিয়াই মহারাণীর প্রশ্নের উত্তর দিল।

তাহার পর সেখানে সীমার সহিত সকলের পরিচয়ের ত্বরা পড়িয়া গেল। দূরে বসিয়া মহারাজ সীমার সুসংযত শিক্ষিত প্রথায় পরিচিত হইবার মধুর ভঙ্গী দেখিয়া সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেখানে উপস্থিত সুন্দরীরা, মহারাজ দলমীরের চোখের পরিচিত কৌতুক-চঞ্চল দৃষ্টির এমন মুগ্ধ তন্ময়তা দেখিয়া ঈষৎ ঈর্ষার বেদনায় বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। অল্প পরে সীমাকে লইয়া মহারাজ চলিয়া গেলে সকলেই তাঁহার সর্ব্ব-সৌভাগ্যের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সীমার রূপ-গুণের দুর্ল্লভতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

২৭

তাহার পর মহারাণী ধারপুর একটি ভোজের আয়োজন করিয়া সীমাকে সমাজের সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার পর, প্রতিদিন এক একটি উৎসব সভায় উপস্থিতির আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল।

সীমা প্রতিদিন আপনার সমস্ত শক্তি সমস্ত শিক্ষা একত্রিত করিয়া মহারাণী দলমীরকে এই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যেন মহারাজ দলমীরের অজস্র দানের মর্য্যাদা দিতে চাহিল, তাই মহারাজ দলমীরের উপহার যে সব বহুমূল্য দ্রব্য এতদিন সীমার অপ্রয়োজনীয় ছিল আজ মহারাণী দলমীরের সেগুলি একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই গুলির মাধুর্য্যে সীমা নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য লইয়া যেন কোন রহস্যালোকবাসিনীর মত অজানার মোহময় আকর্ষণে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার একটু সন্তুষ্টি, একটু হাসির প্রত্যাশায় পুরুষদের মধ্যে মনোরঞ্জনের প্রতি-যোগিতা পড়িয়া যাইত।

মহারাজ দলমীরই ছিলেন এই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সুবেশ সুরূপ মিষ্ট ব্যবহারী; তাই এতদিন প্রতি স্থানেই সমাগত সুন্দরীরা তাহাকে লইয়াই আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া অপর পুরুষের আনন্দকে

ম্লান করিয়া দিত। এখন তাই সুযোগ পাইয়া সেই সব উপেক্ষিতেরা মহারাজের নিকট হইতে সীমাকে দূরে রাখিয়া প্রতিশোধ লইতে চাহিত। নারীরাও যেন এই পত্নী-প্রেম মুগ্ধ মহারাজকে আপনাদের উপেক্ষাকারী মনে করিয়া দূরেই রাখিতে চাহিত। তাই পূর্ব্বের বহু-বাঞ্ছিত মহারাজ এখন একা দূরে বসিয়া কৌতুক হাস্যের-সহিত সীমার প্রশংসাকারীদের পানে চাহিয়া থাকিতেন।

ক্রমে সীমা এই সুন্দরী-বহুলা সমাজে মধ্যমণির মত উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। অতৃপ্ত মহারাজ অনবসর সীমার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমার মুগ্ধ কণ্ঠের মৃদু স্বর আজ বহু কণ্ঠের কোলাহলে তোমার মনের দ্বারে পৌঁছুতে পারে না। তাই অতৃপ্ত আমার অপেক্ষায়ই দিন কাটে।'

এমনি করিয়াই দুইটী মাস কাটিয়া গেল। ক্রমে সীমা এই উৎসব বহুলা নগরীর সামাজিক জীবন যাপন করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু পাছে তাহার এই অক্ষমতা কোন ব্যঙ্গ বহন করিয়া আনে তাহার অনভ্যাসের উপর, তাই সে কিছুই প্রকাশ করিল না। মহারাজও সীমার ক্লান্তি লক্ষ্য করিয়া এই রাত্র দিনের উগ্র উত্তেজনার অন্তরালে দলমীরের সেই শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সমাজের সম্ভ্রান্ত জনের প্রশংসাতৃপ্তা সীমার আনন্দে বাধা দিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। তিনি তাই নীরবে সীমারই বলিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীমাও আপনাকে যেন নিঃশেষ করিয়া দিয়া মহারাজ দলমীরের

মহারাণী নির্ব্বাচনের গর্ব্বকে সকলের কাছে সার্থক করিয়া তুলিবার পণ করিয়াছিল। তাই ক্লান্তিতে সে কাতর হইল না।

কিন্তু অল্পদিন পরেই এক উৎসব সভায় সীমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বহু লোক ও আলোকপূর্ণ গৃহের উত্তাপ তাহার সহ্য হইল না! অসংখ্য আকুল ব্যাকুল শুশ্রূষাকারীর নিকট হইতে সীমার মূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া লইয়া মহারাজ বাড়ী ফিরিলেন। তখনই তাঁহার গাড়ী সহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া সামান্য চেষ্টায় সীমাকে সুস্থ করিয়া, তাহার দেহের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইবার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

সীমা মহারাজের বেদনা-বিবর্ণ মুখের দিয়া চাহিয়া বলিল—'তুমি অমন ভাব্‌ছো কেন, কিছুই হয়নি আমার; শুধু গরমে ও রকম হয়েছিল, এখন বেশ ভালই আছি।'

মহারাজ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'না, সীমা, ডাক্তার বল্লেন, তুমি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ। আমিও সেটা দিন কতক থেকে লক্ষ্য কর্‌ছিলুম। এত অনিয়ম রাতজাগা লোকের গরম সহ্য করা তোমার অভ্যাস নেই, আমার বারণ করাই উচিত ছিল, কিন্তু এতে তোমায় এত আনন্দ পেতে দেখে বাধা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো।'

সীমা বিস্ময় ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'আমায় আনন্দ পেতে দেখে?'

ম্লান হাসিয়া মহারাজ বলিলেন—'হ্যাঁ সীমা! আমি কি ভুল বুঝেছিলুম? তোমার প্রতিদিনের পরিপাটী উৎসব-সজ্জা, বাড়ী

ফিরে সেই আনন্দ-দীপ্ত চোখ আমাকে তো সেই কথাই বলে দিত সীমা! আর এত সুশিক্ষিত সকলের অকুণ্ঠিত স্তুতির মধ্যে আনন্দ পাওয়াই ত স্বাভাবিক সীমা!'

মহারাজের বিষাদ-করুণ কণ্ঠের কথাগুলি শুনিয়া সীমা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া অনুতপ্ত মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন তাহাকে শান্ত করিতে।

একটু পরে শান্ত হইয়া সীমা বলিতে লাগিল—'কেন আমায় বলোনি, তুমি এতে কষ্ট পাচ্ছ। কেন তুমি বুঝলে না তোমার জন্যেই আমার সব করা, পাছে আমার মত নামহীনাকে ভালবাসার জন্যে সবাই তোমার উপহাস করে তাই আমার এত খ্যাতির ইচ্ছা। তুমি কি জান না মহারাজ, আমি নিজে এই বিলাসী জীবনকে কত ঘৃণা করি।'

২৮

পরদিন দুপুরের আহারাদির পর মহারাজ দলমীরের প্রকাণ্ড গাড়ী খানি সুদূর যাত্রার বেশে সজ্জিত হইয়া মহারাজ আর মহারাণীকে বহন করিয়া দলমীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রের তীব্র আলোক সীমার চক্ষু পীড়িত করিবে ভাবিয়া মহারাজ গাড়ীর কাঁচের জানালার সবুজ মখমলের পর্দাগুলি নামাইয়া দিয়া ছোট বিজলী ব্যজনী খানি খুলিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী সহর ছাড়াইয়া অনেকগুলি ছোট গ্রাম পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিল। অল্পদূর যাইতেই একটু একটু করিয়া মেঘ জমিয়া ক্রমে মধ্যাহ্নের দীপ্ত দিবালোক ম্লান করিয়া ফেলিল। শেষ বেলায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল। সে প্রবল বারিপাতে চালকের পথ দেখিয়া চলা সম্ভব হইল না। সে গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। ভিতর হইতে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইল? কারণ শুনিয়া মহারাজ পর্দা সরাইয়া বাহিরে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। সমস্ত পথ-মাঠ বাহিয়া যেন বন্যার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে। এমন বর্ষণ মহারাজ ইহার পূর্ব্বে দেখেন নাই।

সীমার শরীর অসুস্থ; তাই মহারাজ পথের এই বাধায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বার বার চেষ্টা করিয়াও এই বৃষ্টিধারার আবরণ ঘেরা গ্রাম

খানি তিনি চিনিতে না পারিয়া, চালকের পাশে অবস্থিত প্রিয় ও পুরাতন ভৃত্য রঘুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এটি কোন গ্রাম।'

রঘুয়া বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল—'বেলারী, হুজুর।' মহারাজের দেহাবলম্বনা সীমার মনে হইল উত্তর শুনিয়া মহারাজের হৃদয়ের স্পন্দন অতি দ্রুত হইয়া তাঁহার সমস্ত ধমনীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে ঈষৎ বিস্মিত হইয়া ভাবিল হয়তো তাহারই ভুল হইতেছে। বিরামহীন বৃষ্টি ঝরিতেই লাগিল। ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। মহারাজ চালককে হুকুম দিলেন, গাড়ীর প্রধান বাতিগুলি জ্বালিয়া গাড়ী চালাইতে। কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও চালক বারি সিক্ত ইঞ্জিন খানি চালাইতে পারিল না।

মহারাজ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঈষৎ উগ্রকণ্ঠে চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি করিলে কখন সে গাড়ী চালাইতে পারিবে।' চালক বিনীতকণ্ঠে বলিল—'রাত ভোর সে খাটিয়া ইঞ্জিনখানি খুলিয়া মুছিয়া লইয়া কাল প্রভাতেই গাড়ীখানি সচল করিয়া ফেলিবে।' উত্তর শুনিয়া বিচলিত কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন 'তার মানে আজ রাতটা আমাদেরও এখানে থাকতে হবে, এধারে কোথাও তো গাড়ী পাওয়া যায় না জানি।' চালক নিরুত্তরই রহিল। মহারাজ আবার বলিলেন—'বৃষ্টি না থামলে তো তুমি কাজও আরম্ভ কর্ত্তে পারবে না,—উপায়।'

সীমা এইবার ধীরে ধীরে বলিল—'এখানে কোন সরাই কি হোটেল নেই? থাকলে আজ রাত্তিরের মত আমরা সেখানেই আশ্রয় নিয়ে গাড়ীটা ঠিক করে নিতে পারি।'

মহারাজ অধীর কণ্ঠে বলিলেন—'না, না, সে হতেই পারে না, এখানে তোমার থাকা—সে অসম্ভব।'

সীমা ঈষৎ বিস্মিত হইয়া মহারাজের পানে চাহিয়া রহিল। এমন অসহিষ্ণু স্বর সে মহারাজের কণ্ঠে এই প্রথম শুনিল।

সীমার দৃষ্টি মহারাজকে লজ্জিত করিল। তিনি অভ্যস্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'তুমি অসুস্থ সীমা! এমন অসুবিধা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক খারাপ।'

সীমা উত্তর দিল—'উপায় কি মহারাজ! ওদের বল, কোন সরাই কি হোটেল ঠিক কর্ত্তে। আর একটা রাত এখানে আমি ভালই থাকবো, বেশ কেমন সব নতুন অজানা নিয়ম, বেশ ভাল লাগছে আমার।' উপায়-হীন মহারাজ একান্ত অনিচ্ছায় রঘুয়াকে পাঠাইলেন সেখানের একটি মাত্র হোটেলে আপনাদের রাত্রি বাসের আয়োজনের জন্য।

দৈবাধীন মানব-জীবনে এক একদিন এমন বিঘ্ন ঘনাইয়া আসে যে মান সম্ভ্রম অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই অবাঞ্ছিতের আগমন রোধ করিতে পারে না। মহারাজকেও তাই সে রাত্রে একান্ত অনিচ্ছায় সীমাকে লইয়া হোটেলেই আশ্রয় লইতে হইল।

———

২৯

মহারাজের পরিচিত হোটেলওয়ালা সসম্ভ্রমে মহারাজ আর মহারাণীকে-অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

ক্ষুদ্র হোটেলটীর মধ্যে একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গেল।

সীমা একবার চারিদিকে চাহিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘর খানিতে আসিয়া মহারাজকে বলিল—'মন্দ কি মহারাজ বেশ তো।'

মহারাজ ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—'তোমার সুটকেশটা রঘুয়া এখানে রেখে গ্যাছে, কিন্তু তোমার দাসী তো সঙ্গে নেই, আমার কোন সাহায্যের দরকার হবে?'

সীমা মৃদু হাসিয়া বলিল—'না' মহারাজ! মহারাণী দলমীরের অভ্যস্ত জীবন সীমার বেশি দিনের নয়, তার আগে সীমা সব নিজেই করে নিত, এখনও সেটা ভুলে যায়নি।'

মহারাজ একটু হাসিয়া সীমার দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর কাপড় আটকান পিনটী খুলিতে খুলিতে বলিলেন—'বেশ সীমা তাহ'লে তার কাজ শেষ করে ফেলুক, আমি আমার ঘর থেকে কাপড় বদলে খাবার আনতে বলে আস্‌ছি।'

মহারাজ চলিয়া গেলে সীমা কাপড় বদলাইয়া হাত-মুখ পরিষ্কার করিয়া ঘরের একটি জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

পাতলা মেঘের আবরণে ঘেরা ঝাপসা চাঁদের ম্লান আলোয় এই পাহাড়ে ঘেরা গ্রামখানি সীমার চক্ষে মায়ার স্পর্শ বুলাইয়া দিল। মুগ্ধ সীমা অপলক নেত্রে রাত্রির স্তিমিত আলোয় শ্যাম সম্পদময়ী এই গ্রামখানির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। সীমার মনে হইল এই রহস্যময়ী যেন নির্ব্বাক্ ভাষায় তাহাকে পরিচয়ের বন্ধনে বাঁধিতে চাহিতেছে।

কবে কোথায় যেন ইহার কত কথা সে শুনিয়াছিল—কিন্তু কোথায়, কোথায়, কি সে কথা? অস্পষ্ট স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ারে সীমার মন বার বার আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিল, কোন উদ্দেশ তাহার মিলিল না। অস্বচ্ছন্দ মন লইয়া সীমা মহারাজের পদ শব্দে ঘরের মধ্যে সরিয়া আসিল।

সামান্য দুএকটি কথার মধ্যে তাহাদের আহার শেষ হইল। মহারাজের চিন্তাম্লান ঈষৎ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সীমা ভাবিল—কেন? কেবল মাত্র তাহার অসুস্থ দেহে পথে বিলম্বের বাধাটাই কি মহারাজকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল। সীমার মনে হইল হাস্যপ্রিয় মহারাজ বিবাহের পর এই প্রথম তাহাকে লইয়া নিঃশব্দে আহার শেষ করিলেন। আহার শেষ হইলে সীমা মহারাজকে বলিল—'কালই যদি না যাওয়া হয় কি এমন ক্ষতি, এখানে তেমন কোন অসুবিধা নেই, আর গ্রামটাও এমন সুন্দর, আমার বেশ ভাল করে দেখে যেতে ইচ্ছে কচ্ছে।'

মহারাজ ব্যস্তভাবে বলিলেন—'না, না, সে হতে পারে না, আমি শোফারকে বলে এসেছি সারারাত জেগে আজই গাড়ী ঠিক করে

ফেলতে হবে, কাল ভোরেই আমরা এখান থেকে রওনা হবো, চলো এখন তুমি শোবে ; সারাদিনের কষ্টে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয় !'

মহারাজ কথা শেষ করিয়াই সীমার নিকট আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সযত্নে সীমাকে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দিয়া একখানি চাদরে তাহার পা দুটী ঢাকিয়া দিয়া মহারাজ সীমার পাশে বসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'সীমা, আজ রাতটা আমায় ক্ষমা করো, আজ তোমায় একা শুতে হবে। আমি না থাকলে ওরা হয়তো সারারাত জেগে কাজ করবে না। তোমার কোন ভয় নেই। রঘুয়া দরজার বাইরে বসে থাকবে ; কোন দরকার হলে ওকে বললেই ও আমায় ডেকে দেবে।'

অভিমানিনীর অশ্রু তখন উচ্ছল, তাই নিদ্রার ভাণে নিজেকে সে সরাইয়া লইল। মহারাজ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সারারাত্রি অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া বাহিরে মহারাজের পরিচিত পদশব্দ অবিরাম শুনিতে শুনিতে সীমা ভাবিতে লাগিল—এই প্রথম মহারাজ আমার ইচ্ছাকে অবহেলা করিলেন, ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট হইতে দূরে রহিলেন, শঙ্কাকুল মন বার বার ভাবিতে লাগিল কেন ? কেন ? তাহার পর কখন অবসন্ন সে নিদ্রার কোলে অচেতন হইয়া সকল চিন্তা ভুলিয়া গেল।

পরিচিত মৃদু স্পর্শে জাগিয়া চোখ মেলিতেই ঊষার অস্পষ্ট আলোয় সীমা দেখিল মহারাজ দু'টি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর

ফেলিয়া জাগরণ-ক্লান্ত ম্লান মুখে বসিয়া আছেন, তাহাকে জাগিতে দেখিয়া বলিলেন—'তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন সীমা! তুমি কি বিশ্বাস করোনি কাল তোমার জন্যেই তোমাকে একা রেখেছিলুম! তুমি কি জান না সীমা! পৃথিবীতে এমন কোনও কারণ আমার নেই যার জন্যে আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবো।'

সেই মুখ, সেই দৃষ্টি, প্রিয় কণ্ঠের নিবেদিত সেই প্রণয়-গীতি, সীমার সারারাত্রির পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া দিল।

বাহিরে নিশীথের অন্ধকার মুছিয়া ধরণীর বুকে উষার অরুণালোক হাসিয়া উঠিবার মতই সীমার সারা রাত্রির সংশয়াচ্ছন্ন আঁধার অন্তরও প্রিয়তমের প্রেমালোকে হাসিয়া উঠিল। বিগত রাত্রির দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্নের মত তাহার মন হইতে মিলাইয়া গেল।

৩০

প্রভাতে মহারাজ আর মহারাণী দলমীর ভ্রমণ বেশে সজ্জিত হইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য রঘুয়া বাহির হইতে বলিল—'হুজুর, ড্রাইভার বলছে গাড়ী আবার খুলে দেখতে হবে, না হলে চালান যাবে না।'

মহারাজ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'আহাম্মক উজবুকটা কাল সারারাত কি করলে? বেয়াদপ, পাজী, চুলোয় যাক ও গাড়ী, তুই এখনই হোটেলওয়ালার ঘোড়া নিয়ে যা, পাশের গ্রাম থেকে ভাড়া-মোটর নিয়ে আয়, যত টাকা লাগে দিবি, আমি আজই একটু পরে এখান থেকে রওনা হতে চাই।' রঘুয়া 'যো হুকুম' বলিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। মহারাজ ফিরিয়া সীমার নিকটে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন—'এই হতভাগা গাড়ীখানা আমার মেজাজ খারাপ করে তুললে, আমি ভারী অসভ্য হয়ে পড়েছি সীমা নয়? তোমার সাম্‌নে রেগে উঠে তোমাকে বিরক্ত করলুম।'

সীমা মৃদুস্বরে বলিল—'কি আর বিরক্ত।' মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—'তুমি বিরক্ত হওনি তো, বেশ তবে একটু এখানে একা বোসো, আমি একবার দেখে আসি আরো কতদিন গাড়ীখানা এখানে পড়ে থাকবে। এখানে এসে অবধি তোমায় ভারী কষ্ট দিচ্ছি সীমা!

কিন্তু কি করবো উপায় নেই তুমি এখানে কদিন থেকে সব দেখতে চাইছিলে, গাড়ীটাও খারাপ হয়ে গেল উপায় থাকলে থেকেই যেতুম কিন্তু সীমা—থাকলে হয় না।' মহারাজ চুপ করিয়া সীমার মাথার উপর খুব মৃদুভাবে আঙ্গুলগুলি বুলাইতে লাগিলেন। সীমার মনে হইল সে গুলি যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। সীমার সমস্ত মন ব্যগ্র হইয়া আবার জানিতে চাহিল কেন? কেন মহারাজ সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য-মণ্ডিত হইয়াও নিজেকে মনে করিতেছেন উপায়হীন। কিসের বাধা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে।

সীমার স্বাভাবিক শিষ্টতা তাহার মুখাগ্র হইতে উৎসুক প্রশ্ন ফিরাইয়া দিল। সে নিঃশব্দে বসিয়া মহারাজের চঞ্চল আঙ্গুলগুলির মৃদু কম্পন অনুভব করিতে লাগিল।

একটু পরে মহারাজ চলিয়া গেলে সীমা সম্মুখের টেবিলের উপর নত হইয়া দুই হাতের উপর মুখ ঢাকিয়া ভাবিতে লাগিল।

মহারাণী দলমীরের সুখ উচ্ছল জীবনের অন্তরালে ছিল সীমার যে শান্ত জীবনের স্মৃতি, তারি তীরে তীরে সীমার বিভ্রান্ত মন ঘুরিয়া 'বেড়াইতে লাগিল অতীতের অনুসরণে। অস্মরণের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া সীমা ভাবিতে লাগিল—কি, কোথায়, কেন?

৩১

মহারাজের পদশব্দে মুখ তুলিয়া সীমা শুনিল বিপন্ন মুখে চঞ্চল কণ্ঠে মহারাজ বলিতেছেন—'ভয়ানক মুস্কীল হয়েছে সীমা! এইমাত্র পাশের গ্রাম থেকে একটা লোক এসে খবর দিলে রঘুয়া ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ভয়ানক জখম হয়েছে। কেবল মাত্র আমার কথা বলেই অজ্ঞান হয়ে গ্যাছে, তারি ঘোড়া নিয়ে লোকটা এসেছে আমায় খবর দিতে।'

সীমা বলিল—'আহা বেচারী! আমাদের জন্যই এমন করে জখম হোল, তোমার এখনই গিয়ে তাকে চিকিৎসা কর্‌বার ব্যবস্থা করা উচিত মহারাজ।'

মহারাজ ব্যস্তভাবে বলিলেন—'কিন্তু সে কি করে হতে পারে,—তোমায় এখানে একা রেখে কেমন করে যাবো আমি।'

সীমা স্থিরস্বরে বলিল—'আমায় একটু একা থাকতে হবে বলে তুমি একজনের জীবন-মরণ কর্ত্তব্যে অবহেলা করবে মহারাজ।'

মহারাজ বলিলেন—'তুমি বুঝবে না সীমা এখানে তোমাকে একা রেখে যাওয়া আমার কাছে কত কঠিন

সীমা গম্ভীরভাবে বলিল—'তুমি ভুলে যেও না মহারাজ! সীমাকে একদিন একা এই পৃথিবীর উপর পা রাখতে হয়েছিল।'

মহারাজ বিচলিতভাবে বলিলেন—'জানি সীমা! কিন্তু তুমি জান না সীমা যে, সেদিন শুধু তোমার উপরই এই পৃথিবীর একজন লোকের সকল সুখ নির্ভর করে থাকত না।'

সীমা মহারাজের নিকট সরিয়া গিয়া তাঁহার দু'খানি হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল—'জানি মহারাজ! কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার পরিচিত এই হোটেলে কিই বা আমার হতে পারে। একা আমার একটুও কষ্ট হবে না তুমি কর্ত্তব্য করে আসছ ভেবে আমি আনন্দে তোমার প্রতীক্ষা করবো। তুমি আর দেরী করোনা মহারাজ, একটু বিলম্বে হয়তো তার জীবনের ক্ষতি হতে পারে।'

মহারাজ এতক্ষণ সীমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে একটি বিলম্বিত নিশ্বাসে যেন অন্তরের উদ্বেগ অনেকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—'বেশ তাই হোক সীমা! তোমার ইচ্ছাই আমার সব কিছুর চেয়ে আমার কাছে সব সময় বড়, তাই তোমার ইচ্ছাতেই চল্‌লুম আমি, আমার ভয় তুমি বুঝবে না সীমা, শুধু তুমি বলো, ফিরে এসে আবার তোমায় পাবো। ঠিক এমনি করে, বলো সীমা!'

সীমা শুধু তার সুন্দর চোখের দৃষ্টিটুকু মহারাজের মুখের উপর স্থির রাখিয়া বলিল—'ছিঃ মহারাজ'।

৩২

মহারাজ চলিয়া যাইবার পর তাঁহার সেই বিষাদ করুণ স্বর অজ্ঞাত আবেদন-ভরা ম্লান দৃষ্টি অনেকক্ষণ সীমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া জাগিয়া রহিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আবার সেই জানালাটীর নিকট দাঁড়াইল।

রাত্রির স্তিমিত আলোয় যে রূপসী তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ছিল, এখন দিবালোকেও সেই রহস্যময়ী তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। ইহার মাটীতে পা রাখিতেই যে দুর্দ্দৈব তাহাদের ঘিরিয়া ছিল, তাহারই বিড়ম্বনায় ইহার উপর তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

ইহার অশুভ আকর্ষণের বাহিরে যাইবার জন্যই তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

দূরে পাহাড়ের কোলে যে ক্ষীণকায় নদীটী রূপালী রেখায় বহিয়া গিয়াছে, তাহারি কূলে একটি বিরাট ধ্বংস-প্রায় দেবালয় কোন অজ্ঞাত ভক্তের অসীম ঐশ্বর্য্যের প্রায় বিলুপ্ত স্মৃতি বহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারি দিকে চাহিয়া সীমা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে দৃষ্টি ফিরাইতেই সীমা দেখিল—বাহিরে জানালার নিকট একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষের হিংস্র দৃষ্টি দেখিয়া সীমার মনে হইল বুঝি নিকটে পাইলে সে এখনি সীমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।

ভয়ে সীমা জানালা হইতে সরিয়া গিয়া একখানি চেয়ারে অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়িল। এই ভীষণ-নয়না যুবতী সীমার মনে বিপ্লব বাধাইল। কে এ? কেন এই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, তাহার স্মরণালোকে ক্ষীণ প্রভায় একটা অস্পষ্ট স্মৃতির রেখা ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল। সহস্র চেষ্টায় সে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিল না। সে আবার দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া টেবিলের উপর নত হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পদ শব্দে মুখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া সে ভীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বিনয়েন্দ্র দুইহাতে দরজার পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই হোটেলে একা সীমা রাজাকে দেখিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজা ধীরে ধীরে সীমার নিকটে আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন—'তুমি কি আমায় চিনতে পাচ্ছ না সীমা?'

সীমা উত্তর দিল—'আপনি বোধহয় জানেন না, আমায় এখন সকলে মহারাণী দলমীর বলেন, আপনি যে নামে আমায় ডাকলেন, ও নামে এখন একমাত্র দলমীরই ডাকবার অধিকারী। রাজার অট্টহাসিতে ঘরখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল। হাসি থামিলে রাজা বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—'জানি সীমা! তাই আজ চার মাস দিন-রাত চেষ্টা করেও তোমায় একা পাইনি। আজ সেই ধূর্ত্তের অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে তোমার কাছে এসেছি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে, কেমন করে সেই প্রতারক তার সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক, গোপন করে তোমায় প্রবঞ্চনা করে হত্যা-কলঙ্কিত হাতে তোমার হাত ধরে, আর ঘৃণিত রাজ-

সম্মানে তোমার নামের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সমস্ত তোমার কাছে প্রকাশ করে দেব বলে।'

সীমা আপনার ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠ যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল—স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর নিকট তাঁর নিন্দা করা যে অন্যায় এটা কি আমার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?'

রাজা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—'স্বামী! কে তোমার স্বামী সীমা! যে লম্পটের অসংখ্য কুকাজের সাক্ষ্য হয়ে এই বেলারী গ্রামেই এক যুবতী পাগলিনী হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তাকেই স্বামী বলে স্বীকার কত্তে তুমি নিজেই কি লজ্জাবোধ করবে না সীমা!'

হঠাৎ সীমার স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হইয়া অসিতের পত্রখানি স্মরণ-পথে ফুটিয়া উঠিল—'বেলারী! বেলরী! হ্যাঁ এই নামই তো সেই পত্রে লেখা ছিল।'

এখানে থাকিতে মহারাজের এত আপত্তি, পদার্পণেই ভীত-চকিত ভাব, পলায়নের ব্যগ্রতা পাগলিনীর হিংস্র দৃষ্টি সব মিলিয়া সীমার নিকট মহারাজের সকল কলঙ্ক সত্য বলিয়াই প্রমাণ করিল। সে অধীর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল—'প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি? এখনি দেখান আমায়।'

সীমার মনে অবিশ্বাসের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের উগ্র আলোয় তাহার মন হইতে মিলাইয়া গেল মহারাজের বিদায়-কাতর চক্ষের মিনতি-ভরা দৃষ্টি, কণ্ঠের করুণ আবেদন।

রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আমার সঙ্গে এস সীমা! তোমাকে প্রমাণ দেখাব বলে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

নিঃশব্দে সীমা রাজাকে অনুসরণ করিয়া হোটেলের সম্মুখে অবস্থিত রাজার গাড়ীতে উঠিল—হোটেলওয়ালা মহারাজ দলমীরের অত্যন্ত অনুগত ছিল, মহারাজের অনুপস্থিতিতে সীমাকে অপর লোকের সহিত গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া সে কি করিবে স্থির করিতে করিতে গাড়ী সীমাকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

৩৩

হোটেল হইতে দূরে একখানি কুটিরের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিলে রাজা গাড়ী হইতে নামিয়া সীমাকে নামাইয়া লইলেন। সীমার হাত ধরিয়া রাজা কুটিরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সীমা দেখিল সেই ভীষণ-নয়না যুবতী একপাশে বসিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ স্বরে কি বলিতেছে। সীমাকে দেখিয়াই সে ছুটিয়া তাহার নিকটে আসিয়া তেমনি দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। হোটেলের নিরাপদ গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া সীমা যে দৃষ্টি দেখিয়া ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল এখন এত কাছে হইতে তাহার দিকে চাহিয়াও সীমার কোন আতঙ্ক আসিল না। তাহার মন হইতে সকল অনুভূতি যেন মিলাইয়া আসিতেছিল, শুধু তীব্র ব্যথায় জাগিয়াছিল—এইরূপ রস-বর্ণ-গন্ধময়ী ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য্য মাখিয়া যে মুখ খানি এতদিন তাহার বিশ্ব ভরিয়া রাখিয়াছিল, সেই পরম সুন্দর মুখ খানিতে সংগোপনে ছিল যে কলঙ্কের রেখা, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যগ্রতা।

রাজা পাগলিনীর নিকট যাইয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'দেখ, তোমার কথা শুনে ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন, তোমার দুঃখের কথা সব এঁকে বলো, ইনি তোমার কথা সব মহারাজকে বলবেন।'

পাগলিনী আরও ভয়ঙ্করভাবে দাঁতগুলি দিয়া কড়মড় শব্দ করিতে

করিতে সীমার দিকে চাহিয়া উগ্র কণ্ঠে বলিল—'ওকে বলবো কেন? ওই তো মহারাজকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, ওকে না দেখলে মহারাজ ঠিক আমায় বিয়ে করতেন, ওকে আবার সব বলবো আমি, যদি একটা বন্দুক পেতুম তো মহারাজ যেমন করে আমার সেই বুড়ো বরটাকে গুলী করে মেরেছিল, আমিও ঠিক ওকে এখনি তেমনি করে মারতুম, আমার সর্ব্বনাশ করেছে ও, ওকে আমি মারবো না?

পাগলিনীর ভঙ্গী দেখিয়া রাজা তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখ হইতে সীমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'তুমি ভুল কচ্ছ মতি! ইনি তো তিনি নন্। ইনি আমার সঙ্গে এসেছেন এঁকে তোমার চিঠিটা দেখাও, ইনি মহারাজকে তোমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

পাগলিনী একটু শান্ত হইয়া বলিল—'এ, সে নয় তবে যে হোটেলের লোকেরা বল্লে, মহারাজ নূতন মহারাণীকে নিয়ে এসেছেন, আমি তো দেখলুম এই মেয়েটাই দাঁড়িয়ে ছিল হোটেলের জানালায়।

রাজা বলিলেন—'না না ইনি নন্, এঁকে দাও তোমার চিঠিটা ইনি এখনই গিয়ে মহারাজকে তোমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

পাগলিনী সন্দেহ-দৃষ্টিতে সীমার দিকে চাহিতে চাহিতে আপনার অঞ্চল হইতে খুলিয়া বহু হস্তের স্পর্শ মলিন একখানি পত্র রাজার হাতে দিল। রাজা সে খানি সীমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। সীমা কম্পিত হস্তে সে খানি লইয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিল, মহারাজের পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা আছে—

শ্রীমতি সীমা

তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। দুঃখের সহিত জানাইতেছি তুমি যাহা আশা করিয়াছ তাহা অসম্ভব। আমাকে তোমার একজন স্নেহময়ী বন্ধু মনে করিয়া সমস্ত বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। তোমার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া এবার তুমি সুস্থ হইতে চেষ্টা করিবে। আমার অর্থ সামর্থ্য তোমার প্রয়োজনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। সকল অভাব অসঙ্কোচে জানাইবে।

ইতি

মহারাজ দলমীর

পত্র খানি রাজার হাতে ফেরত দিয়া সীমা শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—'আমায় নিয়ে চলুন।'

রাজা তাহার অবসন্ন দেহ ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সীমা গাড়ীর পশ্চাৎ দিকে দেহ ভার রাখিয়া চোখ দু'টী বন্ধ করিয়া বলিল —'আমি হোটেলে ফিরে যাব না, আমায় দলমীরে মিসেস মিত্রের কাছে নিয়ে চলুন।'

রাজার মনে হইল সম্মুখবর্ত্তিনী সীমার স্বর যেন বহু দূরাগতের মত মৃদু। তিনি গাড়ীর দরজাটী বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন —'বেশ, আমার গাড়ী নিয়ে তুমি যাও, আমার এখানেই কাজ আছে। এরা আমার বিশ্বাসী, তোমার কোন ভয় নাই।'

কথাগুলি সীমার কাণে পৌছিল কি না রাজা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চালকের নিকট সরিয়া গিয়া তাহাকে

সীমার নির্দ্দেশ মত স্থানে পৌছাইয়া দিয়া এখানেই ফিরিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন। গাড়ী সীমাকে লইয়া অদৃশ্য হইলে রাজা ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন।

হোটেলওয়ালা উৎকণ্ঠিত হইয়া হোটেলের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিল, রাজাকে একা ফিরিতে দেখিয়া সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা গম্ভীরভাবে বলিলেন—'তিনি একটু পরে গাড়ীতে ফিরিবেন।' কথাকটি বলিতে বলিতেই রাজা ভিতরে গিয়া মহারাজ দলমীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া মহারাজ দলমীরের ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

———

৩৪

ঘরে ঢুকিয়াই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় রাজা বিনয়েন্দ্রকে দেখিয়া মাহারাজ দলমীর চমকিয়া উঠিলেন। শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া সীমাকে না দেখিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—'মহারাণী দলমীর কোথায় রাজা !'

মহারাজের কম্পিত কণ্ঠের স্বর শুনিয়া মুখের বিবর্ণ ব্যাকুলতা দেখিয়া রাজার মুখ নিষ্ঠুর পরিতৃপ্ত হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তিনি বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে, তোমার মহারাণীত্বে পদাঘাত করে সীমা এতক্ষণ অনেক দূরে চলে গ্যাছে।'

'চলে গ্যাছে? সীমা চলে গ্যাছে?' কাতরকণ্ঠে বলিতে বলিতে মহারাজ অবসন্নভাবে সম্মুখের চেয়ার খানিতে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। উচ্ছ্বসিত রোদন-বিহ্বল আত্মহারা মহারাজ অস্ফুট কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'সীমা! সীমা! আমায় অবিশ্বাস করে চলে গেলে, কেমন করে পারলে, কেন একটিবার আমায় জিজ্ঞাসা করলে না, সীমা! সীমা!'

প্রিয়াহারার অসহ্য আঘাত মহারাজের সমস্ত বোধশক্তিকে লুপ্ত করিয়া দিল, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন হইতে মিলাইয়া গেল সম্মুখেই রাজা বিনয়েন্দ্রের উপস্থিতি, তাঁহার পদগৌরব, ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা, বালকের মত অসহায় কান্নায় কণ্ঠ ভরিয়া কেবল মাত্র পলায়িতা প্রিয়তমার নামটীকেই

অন্তরের অসীম প্রেমে সিক্ত করিয়া নিরুপায় ব্যাকুলতায় ডাকিতে লাগিলেন—সীমা! সীমা! যেন এই আর্তস্বর দুইটী মাত্র অক্ষরের আশ্রয় লইয়া দুরান্তবাসিনী প্রিয়তমাকে ফিরাইয়া আনিবে।

রাজা বিনয়েন্দ্র মহারাজের মত হাস্য-চঞ্চল বলিষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল যুবার এমন বালকের মত অসহায় কান্নার বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া কেমন যেন বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিশোধ পরিতৃপ্ত মনে কেমন যেন অনুতাপ বোধ হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে মহারাজ দলমীর মুখ তুলিয়া রোদনারক্ত ম্লান চোখ দুটি রাজার মুখের উপর রাখিয়া অবসন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কথা বলে তাকে এতখানি নিষ্ঠুর করতে পারলে রাজা? কি প্রমাণ পেয়ে সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারলে?'

রাজা বলিলেন—'তোমার নিজের লেখা চিঠি তিনি পাগলির কাছ থেকে দেখে গ্যাছেন।'

মহারাজ বলিলেন—'ভুল, ভুল, সব ভুল! রাজা তুমি জান না কি মিথ্যার আঘাত তুমি দিয়েছ তাকে, আমি জানি এ ব্যথা সে সইতে পারবে না। বল রাজা সে কোথায়? কেমন করে আমি এখনই তার কাছে যেতে পারবো, বল রাজা! তাকে আমার বোঝাতে হবে আমি নিষ্কলঙ্ক, তাকে বাঁচাতে হবে। তুমি সীমাকে ভালবাস রাজা তুমি কেমন কার পারলে তাকে এত বড় আঘাত দিতে। আমি জানি সে পারবে না, এ ব্যথা সে সইতে পারবে না; কিন্তু পারলুম না, এত চেষ্টা করেও এই মিথ্যার আঘাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারলুম না।'

রাজা এইবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'দলমীর! তোমার নিজের হাতের লেখা প্রমাণ রয়েছে, তবু তুমি বলতে চাও, বিশ্বাস করাতে চাও, আমাদের সব মিথ্যা।'

মহারাজ দলমীর অবসন্নভাবে বলিলেন—'আমি নিজে কিছুই বলবো না রাজা! তুমি এস আমার সঙ্গে, বিশ্বাসী লোকের মুখেই শুনবে আমার নির্দোষিতার কথা।'

রাজা বিনয়েন্দ্র উঠিয়া মহারাজ দলমীরের সহিত বা'হরে আসিয়া পল্লীর নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর আসিয়া নদীতীরে ভগ্নপ্রায় বৃহৎ দেবালয়টীর দ্বারের নিকট থামিয়া মহারাজ দলমীর রাজাকে বলিলেন—'এই মন্দিরেই আমাদের যেতে হবে, এখানকার বৃদ্ধ পুরোহিত আমার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী। তাঁহারই মুখে তুমি সব শুনতে পাবে। আশা করি এই আজন্ম নিষ্ঠাচারী চিরকুমার পুরোহিতকে তুমি অবিশ্বাস করবে না?'

রাজা কি বলিতে যাইতেই সেই মন্দিরের মধ্য হইতে সেই পাগলিনী ছুটিয়া বাহির হইয়া মহারাজ দলমীরের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়া সবলে আঘাত করিয়া আবার ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজ সেই পথের ধূলার পরেই লুটাইয়া পড়িলেন। মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে মহারাজ বলিতে লাগিলেন—'সীমা! আর দেখা হোল না, রাজা, বন্ধু আমার, যদি সীমা বেঁচে থাকে তাকে বোলো আমি নির্দ্দোষ, পৃথিবীতে সেই আমার একমাত্র প্রিয়তম।'

রাজা বিনয়েন্দ্র চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চিৎকার শুনিয়া

মন্দিরের পুরোহিত বাহিরে আসিয়া শুভ্র চন্দ্রালোকে মহারাজকে পথের ধূলার 'পরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মাথাটী আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া চিৎকার করিয়া মন্দিরের ভৃত্যকে ডাকিয়া হোটেলে খবর দিতে বলিলেন।

ক্ষতস্থান হইতে অবিরাম রক্তস্রাব হইয়া ক্রমে মহারাজের চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'আপনি এই রাজার কাছে আমার কলঙ্কের সত্য ঘটনা বলবেন, আর পাগলীকে কিছু বলবেন না এর জন্যে।'

ক্রমশঃ মহারাজ জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন। মন্দিরের ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া হোটেলওয়ালা উন্মত্তের মত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংজ্ঞা-হীন মহারাজের পাশে বসিয়া পড়িল।

পুরোহিতের আদেশে মন্দিরের মধ্যেই মহারাজের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে সকলে মিলিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিল। পুরোহিত সেই শয্যাশায়িত মৃতপ্রায় বিবর্ণ দেহের পানে চাহিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—'কেউ কি এখনই একটা ডাক্তার আনতে পার না, এত বড় মহৎ প্রাণ এমন করে নষ্ট হয়ে যাবে?'

রাজা বিনয়েন্দ্র যেন এতক্ষণ সংজ্ঞাহীনের মত স্তব্ধ হইয়া মহা-রাজের রক্তাপ্লুত বিবর্ণ দেহের পানে চাহিয়াছিলেন। চেতনাহীনের মতই তিনি মহারাজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। এতক্ষণে যেন তাঁহার মনে সাড়া আসিল। পুরোহিতের কথা শুনিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—'যাও, যাও, তোমরা

যেখানে ডাক্তার পাও নিয়ে এসো, যত টাকা লাগে এখনি দেব, দেরী করো না।'

বড় বড় ডাক্তারের জন্য সহরে লোক পাঠাইয়া হোটেলওয়ালা নিজে ছুটিল পাশের গ্রামের একটি মাত্র ডাক্তারকে তখনি লইয়া আসিতে।

ক্রমে মহারাজের দেহ মৃতের মত নিশ্চল হইয়া পড়িল। রাজা সেই বিবর্ণদেহের মর্ম্মর শুভ্র মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি নিঃশব্দ চরণে প্রভাতের দিকে চলিতে লাগিল।

৩৫

প্রভাতে সহর হইতে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া মহারাজকে পরীক্ষা করিয়া বলিল—'এখন আমরা কোনই আশা দিতে পারি না, রোগীর আত্মীয়দের খবর দিন, যে কোন মুহূর্ত্তে এঁর মৃত্যু হতে পারে।'

রাজা বিনয়েন্দ্র ডাক্তারদের কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল অসহ্য অনুতাপে বুঝি তিনি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবেন।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি উঠিয়া পুরোহিতের নিকট যাইয়া বলিলেন—

'আপনি নিশ্চয় দলমীরকে খুব স্নেহ করেন, তাকে বাঁচাবার জন্য আপনি নিশ্চয় খুবই চেষ্টা করবেন।'

বৃদ্ধ পুরোহিতের চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ধীর প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন—'সংসারত্যাগী আমি, জানি না সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ কত গভীর হয়, তাই আমি শুধু বলতে পারি এই পৃথিবীতে যাদের আমি ভালবাসি তাদের মধ্যে এই মহৎ উদার মন মহারাজই আমার মনের সব চেয়ে বেশী স্থান অধিকার করেছেন। এঁর জীবনের জন্যে এমন কোন ক্ষতি নেই যা আমি সহ্য করতে পারি না।'

রাজা বিনয়েন্দ্র বলিলেন—'তা হলে এঁর সেবার ভার আপনার উপর দিয়ে আমি যেতে পারি?'

পুরোহিত বলিলেন—'এ সময় তুমি কোথায় যাবে বাবা! এ যে বড় কঠিন ভার, যদি মহারাজকে না রাখতে পারি।'

রাজা অধীরভাবে বলিলেন—'উপায় নেই, যে করে হোক সীমাকে এখন ফিরিয়ে আনতে হবে আমায়। তাই আমরা না আসা অবধি মহারাজকে দেখবার ভার আপনার নিতেই হবে।'

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তিনি ?'

রাজা উত্তর দিলেন—'মহারাণী দলমীর। মহারাজের যে কলঙ্কের রহস্য আপনি জানেন তারই সত্যতায় বিশ্বাস করে তিনি মহারাজকে ত্যাগ করে গ্যাছেন! আমিই এই অনর্থের কারণ, কেমন করে সেই পাপের এত বড় শাস্তি গ্রহণ করবো, আমার ঈর্ষার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে অমন সুন্দর যুবা পৃথিবী থেকে অতৃপ্ত মনে বিদায় নেবে একি হতে পারে? না, না, এ আমি হতে দেব না, যেমন করে হোক দলমীরকে বাঁচাতে হবে, সীমাকে ফেরাতে হবে, আমি যাবো এখনি যাবো।' রাজা অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কথাগুলি বলিতেছিলেন। পুরোহিত ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'অধীর হয়োনা বাবা! ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি ভালই করবেন। হয়তো তিনি তোমাকে উপলক্ষ্য করে মহারাজের এই দেশ-জোড়া কলঙ্কটা ভঞ্জন করে দিতে চান, তাই এই অঘটন। এ না হলে মহারাজের কলঙ্কের কারণ কোন দিনই প্রকাশ হোত না। ব্যস্ত হয়োনা, মনে হচ্ছে মহারাজ ভালই হয়ে যাবেন। তুমি একটু স্থির হয়ে এখন মহারাজের মিথ্যা কলঙ্কের কারণটা শোন, মহারাণীকে তোমার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

রাজা অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—না, না, এখন নয়, আগে সীমাকে

নিয়ে আসি তখন তাকেই আপনি নিজে বলবেন।' কথা কটি শেষ করিয়া রাজা আসিয়া মহারাজের শয্যাপাশে দাঁড়াইলেন।

পুরোহিত তাঁহার সঙ্গে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃতপ্রায় মহারাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজের শয্যার নিকটে দুইজন শুভ্র-বসনা সেবিকা বসিয়া গম্ভীর-ভাবে মহারাজের নিথর মুখের পানে চাহিয়া আছে—সে মুখে জীবন-মৃত্যুর কোন চিহ্নই নাই। যেন জাগ্রত জগতের অসহ্য আঘাতে ব্যথা পাইয়া মহারাজ কোন অনুভূতিহীন সুপ্ত জগতে প্রশান্ত মুখে বাস করিতেছেন। তাই সে মুখে নাই হারাইবার হাহাকার, নাই বিরহের ব্যাকুলতা। সর্ব্ব-হারা রিক্ততার রেখা সে মুখের কোথাও আর চিহ্ন রাখিতে পারে নাই যেন পৃথিবীর পাওয়া ব্যথা পৃথিবীর বুকের পরেই ঢালিয়া দিয়া, দুঃসহ দুঃখের স্মৃতিবাহী চেতনাকে বিস্মরণের অতল সায়রে বিসর্জ্জন দিয়া মহারাজ প্রশান্ত মনে বিদায় ক্ষণের প্রতীক্ষায় আছেন।

রাজা এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। বাহিরে আসিয়াই শুনিলেন সীমাকে দলমীরে রাখিয়া তাহার গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা তখনই সেই গাড়ী লইয়া দলমীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।



৩৬

পরদিন প্রভাতালোক ফুটিতে ফুটিতেই রাজার গাড়ী আসিয়া দলমীরে মিসেস মিত্রের দ্বারের নিকট থামিল। রাজা গাড়ী হইতে নামিয়া অপরাধীর মত নত মস্তকে ভিতরে গিয়া মিসেস মিত্রকে খবর দিতে বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্বল্প পরেই মিসেস মিত্র আসিয়া ম্লান মুখে ঘরে ঢুকিলেন। রাজা কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাহার দিকে তুলিতে পারিলেন না; নত মুখেই বসিয়া রহিলেন। মিসেস মিত্র তাহার নিকটে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন—'কি খবর রাজা! এত দিন পরে তোমায় ফিরতে দেখে ভারী সুখী হলুম। ভালই আছ নিশ্চয়।'

রাজা তেমনি নত নেত্রে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন—'মহারাণী দলমীর এসেছেন আপনার কাছে, আমি তাঁকেই ফেরাতে এসেছি, মহারাজ দলমীর মৃত্যু-শয্যায়।'

মিসেস মিত্র চমকিত ভাবে বলিলেন—'দলমীর মৃত্যুশয্যায়? কেন রাজা কি হয়েছে, কিছুই তো আমি জানি না, সীমা আমার কাছে এসেছে যেন সীমার প্রেত মূর্ত্তির মতো, তাঁর ভাবহীন বিবর্ণ মুখ দেখে জীবনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না, সে শুধু একটি বার আমায় এসেই বলেছিল 'মা! আমি তোমার কাছেই ফিরে এলুম, আমায় আবার যেন তার কাছে ফিরিয়ে দিওনা' তাকে দেখে ভয় পেয়ে তখনি বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলুম; সেই থেকে আর উঠেও নি কোন কথাও বলেনি, নিঃশব্দে শুধু চোখ বুজে

শুয়ে আছে। ডাকলেও সাড়া দেয় না, মনে হচ্ছে কিছুই যেন তার কাণে পৌছুচ্ছেনা। তুমি যদি কিছু জান তো বল রাজা, মন আমার বড় ব্যস্ত হয়েছে।'

রাজা সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া সীমাকে সত্বরই লইয়া যাইবার প্রয়োজন জানাইলেন। মিসেস মিত্র অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'একটু অপেক্ষা করো রাজা! আমি এখনই সীমাকে আনছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাব, ওরা দুজনে আমার অন্তরের কোন্ স্থান যে অধিকার করেছে, সে শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। ওদের এ সময় তো আমি দূরে থাকতে পারবো না রাজা।'

কথাগুলি বলিয়া মিসেস মিত্র বাহির হইয়া সীমার ঘরে গেলেন। সীমা তেমনি নিঃশব্দে শুইয়াছিল। মিসেস মিত্র তাহার পাশে বসিয়া কপাল হইতে কয়েক গাছা চুল সযত্নে সরাইয়া দিয়া মুখের দিকে ঈষৎ নত হইয়া ডাকিলেন—'সীমা!'

সীমা কোন সাড়া দিল না। তাহার মন যেন দেহাতীত কোন কল্পলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তাই এ জগতের কোন শব্দ স্পর্শ তার দেহে কোনও অনুভূতি আনিতে পারিতেছিল না। মিসেস মিত্র আবার বলিলেন—'সীমা! দলমীর ভয়ানক অসুস্থ, ওঠো, এখনই আমাদের যেতে হবে।'

সীমা এইবার চক্ষু খুলিয়া মিসেস মিত্রের দিকে চাহিল। তাহার ভাব-হীন দৃষ্টি যেন প্রশ্ন-ব্যাকুল।

মিসেস মিত্র বলিলেন—'দলমীর অসুস্থ সীমা! আমাদের এখনি যেতে হবে।'

সীমা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল—'আমি জানি, আমার উপেক্ষার অপমান সে সহ্য কত্তে পারবে না ; তবু আমি তাকে ফেলে এসেছি। আমি যাব, আমি যাব।'

আপন মনে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কথাগুলি বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। মিসেস মিত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'তুমি বসো সীমা! আমি এখনই তোমায় নিয়ে যাব।'

অল্প পরে সীমাকে লইয়া প্রস্তুত হইয়া মিসেস মিত্র রাজার নিকট আসিতেই সীমা রাজাকে দেখিয়া ভয়-বিপন্ন মুখে মিসেস মিত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'ও কেন এখানে? ওই তো মহারাজকে মারবে। ওকে সরিয়ে দাও মা!'

মিসেস মিত্র সীমাকে আপনার দুই হাতের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—'ওঁকে ভুল বুঝ না সীমা! উনিই তোমায় নিতে এসেছেন।'

মিসেস মিত্রের কথায় সীমা ধীরে ধীরে রাজার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। রাজা, মিসেস মিত্র, আর অর্দ্ধ-চেতন অচঞ্চল সীমাকে লইয়া গাড়ী বেলারী অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

৩৭

রাজা সীমা আর মিসেস মিত্রকে লইয়া আসিবার পর দুই দিন কাটিয়া গেল।

ডাক্তার, ঔষধ, সেবিকা—কোন প্রয়োজনেরই ত্রুটি রহিল না। কিন্তু এই চিকিৎসা, সেবা, সকলের দেবতার দ্বারে আকুল প্রার্থনা, কিছুই যেন এই অভিমানী মৃত্যু-পথযাত্রীকে ফিরাইতে পারিল না। সে যেন ধরণীর নির্ম্মমতায় যৌবনের আশা-আনন্দোজ্জ্বল জীবনের যবনিকা ফেলিয়া দিয়া, কোন অজানা লোকে মমতাময়ীর অন্বেষণে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সীমা আসিয়া অবধি মহারাজের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার অনিমেষ দৃষ্টি দিয়া মহারাজের জীবন-মৃত্যুর আলো-ছায়ায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত মুখের পরে চাহিয়াছিল। এই প্রিয়মুখ দৃষ্টির উপর হইতে চিরদিনের জন্য মিলাইয়া যাইবে সহস্র সাধনায় ইহাকে ধরিয়া রাখা যাইবে না, এ চিন্তার অবসর সীমার ছিল না। তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া জাগিয়াছিল একটি মিনতি-কাতর কণ্ঠ, দুটি চোখের ব্যাকুল বিদায়-কাতর দৃষ্টি, সমস্ত মন একাগ্র হইয়াছিল শুধু যে দুটি চোখ তাহারই উপেক্ষার অভিমানে মুদিয়াছিল তাহার উন্মীলন মুহূর্ত্তে বলিবার জন্য—আমি আসিয়াছি তুমি যাহাই হও, তোমাকে বিদায় দিবার শক্তি আমার নাই।

ক্রমে আবার রাত্রি আসিল। ডাক্তাররা বার বার আসিয়া মহারাজকে পরীক্ষা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাহাদের মুখ

নৈরাশ্যের অন্ধকারে ম্লান হইতে লাগিল। সকলেই মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'রাত যদি কাটে'। কিন্তু রাত্রি বুঝি কাটিবে না ; সকলের মুখেই শোকের ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

মিসেস মিত্র ধীরে ধীরে দেবদ্বারের সম্মুখে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। সকলেই অনুভব করিতে লাগিল মৃত্যু যেন নিঃশব্দ চরণে আসিয়া মহারাজের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়াছে ; এখনই বুঝি সে নির্ম্মম এতগুলি বেদনা-কাতর চক্ষের সজল দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া অদৃশ্য আত্মাটীকে লইয়া চলিয়া যাইবে।

এই মৃত্যু-চঞ্চল বেদনা-উদ্বেল গৃহের মধ্যে শুধু সীমা তেমনি অচঞ্চল একাগ্র দৃষ্টি মহারাজের মুখের পরেই স্থির রাখিয়া বসিয়াছিল।

এই আশা-ভাষা-ভরা পৃথিবীর সকল কিছুই তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া জাগিয়াছিল দুটি বিশ্বভুলান আঁখির অভিমানাহত দৃষ্টি।



৩৮

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। মিসেস মিত্র উঠিয়া ঘরে আসিয়া এক পাশে বসিলেন। সীমার সেই নিরুদ্বেগ অচঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া চোখ দুটি তাঁহার বার বার সিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে ধীরে ধীরে পুরোহিত আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। একবার মহারাজের শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া এক পাশে বসিয়া সীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মা! মহারাজ জ্ঞান হারাবার আগে আমায় অনুরোধ করেছিলেন তার মিথ্যা কলঙ্কের কথা তোমাদের কাছে বলতে। হয়তো তার এ অনুরোধ রাখবার প্রয়োজন পরে আর থাকবে না, তাই এখনই আমি বলতে চাই, জানি এখন সবার শোনবার মত মন নেই, তবু আমায় বলতে হবে।'

পুরোহিত কথা শেষ করিয়া আবার সীমার দিকে চাহিলেন। সে মুখ দেবী-প্রতিমার মত স্তব্ধ, প্রথম দৃষ্টিতে যেন তেমনি অপলক।

পুরোহিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—'এই বেলারি গ্রামখানি মহারাজের খুব প্রিয়। প্রায় বছর আষ্টেক আগে মহারাজ প্রথম এখানে আসেন, তখন শীতকাল। প্রতি শীতের সময়ই এখানে অনেক সৌখীন ধনীরা আসেন বেড়াতে। তখন এখানকার ওই হোটেলটা আর সমস্ত গ্রামটা বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁদের আসবাবে আর আয়োজনে। তারপর প্রথম বসন্তে তাঁরা সকলে ফিরে যান সহরে, তখন গ্রামটা আবার শান্ত হয়ে যায়।

প্রথমবার মহারাজ এসেছিলেন এঁদেরই সঙ্গে, তাই সহরের আদব-কায়দার সামাজিকতার সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপ-ভোগ করে তিনি আনন্দ পাননি। তাই পরের বছর থেকে সহরের বিলাসীরা ফিরে গেলে মহারাজ এখানে এসে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতেন।

এখানকার আসল বাসীন্দারা সবাই চাষী ; তাই মহারাজ এখানে খুব সাধারণভাবে থাকলেও তারা মহারাজের পরিচয় জানতো বলেই ভয়ে দূরে থাকত। কেবলমাত্র ওই হোটেলওয়ালা আর আমিই ছিলুম মহারাজের গল্প-গুজবের সাথী। কত দিন ওই নদীর ধারে শেষবেলার সোণালী রোদে গল্প কর্ত্তে বসে আমরা উঠতুম অনেক রাত্রে, আজন্ম ঐশ্বর্য্য-পালিত এই মহারাজের মনে সকল বিষয়ের এমন সহজ জ্ঞান তীক্ষ্ণ বিচার ছিল যে, যে কোন বিষয় এঁর সঙ্গে আলোচনা করে একটা আনন্দ পাওয়া যেত। এমনি করে আসা যাওয়া কর্ত্তে কর্ত্তে প্রায় বছর চারেক কেটে গেল এমন সময় শীতের প্রথমে দেবীপ্রসাদ বলে একজন এখানকারই বাসীন্দা সহরে অনেকদিন বাস করে ফিরে এলো, তার সঙ্গে এলো তার একমাত্র মেয়ে মতি, মেয়েটী বেশ সুন্দরী যুবতী, চালে-চলনে বড় ঘরের সৌখীন মেয়েদের মতই।

তারা এখানে বেশ ভদ্রলোকের মতই বাস কর্ত্তে লাগলো, ছোট-লোক চাষা বলে নিজের জাতের সঙ্গেও তারা মিশতো না, তাদের বেশ তাচ্ছিল্য করেই চলতো বলে তারা সবাই ওদের উপর রেগে গেল। দেবীপ্রসাদ খুব বুড়ো আর অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছিল।

মাঝে মাঝে এই মন্দিরে এসে বসে আমার কাছে তার পূর্ব্ব অবস্থার কথা বলত। সে নাকি অনেক টাকাই উপায় করেছে, সহরে খুব বড় চালে থাকতো বলে কিছুই জমাতে পারিনি। মতিকে অনেক পয়সা খরচ করে অনেক কিছু শিখিয়েছে, আশা কচ্ছে সে সুন্দরী, কোন বড়লোক তাকে বিয়ে করবে, তা হলে বুড়ো বয়সে তার আর কোন ভাবনা ভাবতে হবে না, সেই আশাতেই সে মতিকে এখানে এনেছে, এখানে প্রতি বছর শীতে অনেক বড়লোক আসেন কেউ না কেউ মতিকে পছন্দ করবেই।

এমনি করেই আর একটা শীত চলে গেল; দেবীপ্রসাদের আশা পূর্ণ হোল না—মতিকে কেউই পছন্দ করলে না। এইবার সে একটু হতাশ হয়ে মাঝে মাঝে বলতে লাগলো; তার টাকা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে এবার শীতে মতির বিয়ে না হলে আর তাদের কোন উপায় নেই। ক্রমে ওদের অভাব বেশ প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগলো, তবু দেবীপ্রসাদ মতিকে ওদের জাতের কোনও কাজে দেয় না, কেবল আমার কাছে এসে কাঁদে, মন্দিরের দেবতা আমার হাতে দিয়ে তাকে যা কিছু দেন তাতেই কোন রকমে দিন কাটায়, এমনি করে আবার শীত এলো।

প্রথম শীতেই ওই হোটেলে এক বুড়ো জমীদার এলো, সঙ্গে অনেক লোক জন, হোটেলের অনেকগুলা ঘর নিয়ে খুব ধূমধামে থাকতে লাগলো। কিছুদিন পরে শুনলুম সেই বুড়ো নাকি মতিকে বিয়ে করবে। শুনে বেচারী মতির জন্যে একটু দুঃখ হলেও গরীব ওরা—ওদের পয়সার অভাবটা যে যাবে আর দেবীপ্রসাদের এতদিনের আশাটা মিটবে ভেবে একটু আনন্দই পেলুম।

কিন্তু তার পরদিনই সন্ধ্যেবেলা মতি এসে আমার কাছে কেঁদে পড়লো। বলে সে ওই বুড়োকে কিছুতেই বিয়ে করবে না, আমি যদি তাকে না বাঁচাই তো সে আত্মহত্যা করে ওই বুড়োর হাত থেকে উদ্ধার পাবে।

মহা বিপদে পড়লুম আমি। জানছি আমার কোন শক্তি নেই এর থেকে ওকে বাঁচাবার, দেবীপ্রসাদ কোন কথাতেই তার এতদিনের আশা করা সুযোগ ছাড়বে না তবুও তখনকার মত মতিকে শান্ত করে বাড়ী পাঠালুম।

শীতের শেষে বিয়ের সব ঠিক করে বুড়ো জমীদার দেশে গ্যাল; সেখানে সব ঠিক করে মতিকে নিয়ে যাবে, বিয়ে তার নিজের দেশে হবে। মতি তো আমার দেওয়া ভরসায় বেশ নিশ্চিন্ত রইল, কিন্তু আমার দিন মহা দুর্ভাবনায় কাটতে লাগলো। কোন উপায়ই ঠিক কর্ত্তে পারলুম না। এমন সময় প্রথম বসন্তে প্রতি বছরের মতো মহারাজ এখানে এলেন।

আমি তাকে সব বলে তার পরামর্শ চাইলুম। মহারাজ তাঁর কোমল মনে মতির দুঃখ অনুভব করে আমাকে বল্লেন, তিনি নিজেই এর প্রতিকার করবেন, আমার কোন ভাবনা নেই।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। জানতুম এই নির্ভীক তেজস্বী যুবক পৃথিবীর কোন বাধাকেই ভয় করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না।

তার পরদিনই মহারাজ দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়ে এই বিয়ে দিতে বারণ করলেন; কিন্তু দেবীপ্রসাদ ছিল যেমন ফন্দিবাজ তেমনি কূটবুদ্ধি। যুবক মহারাজ মতিকে বিয়ে দিতে বারণ কচ্ছেন দেখে মস্ত একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে অনেক মতলব মাথায় রেখে মুখে অস্বীকার করলে। সেদিন

মহারাজ তাকে অনেক চেষ্টা করেও রাজী কর্ত্তে পারলে না। দেবীপ্রসাদ চলে গেলে আমায় বল্লেন মতিকে বলবেন তার কোন ভয় নেই, আমি থাকতে সে বুড়োর সাধ্যও হবে না মতিকে বিয়ে কর্ত্তে, আমি তাকে যে করে হোক ফিরিয়ে দেব।

দিন পনর পরে সেই বুড়ো এলো তার লোকজন গাড়ী ঘোড়া নিয়ে মতি আর তার বাবাকে নিতে। মতি এসে কেঁদে পড়লো আমার কাছে। তাকে শান্ত করে বাড়ী পাঠিয়ে গেলুম হোটেলে মহারাজকে খবর দিতে।

তিনি সব শুনে চাকরটাকে একটা বন্দুকে গোটা কত ফাঁকা গুলি ভরে সঙ্গে আনতে বলে হোটেলওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে তখনি চললেন দেবীপ্রসাদের বাড়ী।

আমরা গিয়ে দেখি দেবীপ্রসাদের বাড়ী গ্রামের লোকে ভরে গিয়েছে। কিছুতেই যাবে না বলে মতি এক পাশে বসে আছে তার কাছে বসে দেবীপ্রসাদ তাকে বোঝাচ্ছে আর সামনে দাঁড়িয়ে সেই বুড়ো তার ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যের কথা বলে লোভ দেখাচ্ছে। তাদের চারি পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সব মজা দেখা মেয়ের দল। মহারাজকে দেখে সবাই একটু অবাক্ হয়ে এদিক ওদিক সরে দাঁড়ালো। মহারাজ সোজা গিয়ে দেবীপ্রসাদকে উঠে আসতে বলে তাকে বোঝাতে লাগলেন। মহারাজকে দেখেই দেবীপ্রসাদের মুখে ফুটে উঠলো একটা বিশ্রী হাসি ; সে একই কথা বলতে লাগলো বার বার 'এমন বড়লোক জামাই ছাড়বে সে কিসের জন্যে।'

মহারাজ তাকে রাজী কর্ত্তে না পেরে গেলেন সেই বুড়োর কাছে। মহারাজকে দেখে মহা চটে সে গাল দিতে আরম্ভ করলে। একে সে মহা-

রাজের পরিচয় জানতো না, তার উপর মহারাজের মত সুন্দর যুবকের মতির পক্ষ নিয়ে বলতে আসায় সে জ্ঞানশূন্যের মত কদর্য্য কথা বলে গাল দিতে লাগলো। তখন মহারাজ তার অচঞ্চল দৃঢ় কণ্ঠে তাকে বল্লেন—তিনি এখানে উপস্থিত থাকতে মতিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

শুনেই বুড়ো তার লোকজনকে হুকুম দিলে মহারাজকে মেরে জখম করে ফেলতে। বুড়োর লোকরা মহারাজের সবল দেহ আর হাতের বন্দুকের দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ কর্ত্তেই বুড়ো আরো রেগে তাদের শাস্তির ভয় দেখাতেই তারা সকলে এক সঙ্গে মহারাজের দিকে আসতেই মহারাজ তার বন্দুকটা ওপর দিকে তুলে একটা গুলি ছুঁড়লেন। বুড়ো তখন রাগে ও উত্তেজনায় উঠানের এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। গুলিটা তার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতেই সে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। মহারাজ হাতের বন্দুকটা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে তুলতেই দেখলেন দেহ প্রাণহীন।

মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না। তাই তিনি বিস্ময়ে অবসন্নের মত সেইখানেই বসে পড়লেন। জমীদারের লোক ছুটলো পুলিশ ডাকতে।

পুলিশ এসে মৃতদেহে আঘাতের কোন চিহ্ন না পেয়ে আর মহারাজের সম্মান আর অর্থের দিকে নজর রেখে, আঘাতের আশঙ্কায় মৃত্যু হয়েছে বলে, মহারাজকে অব্যাহতি দিয়ে গেল। মর্ম্মাহত মহারাজ নিঃশব্দে হোটেলে ফিরে এলেন।

পরের দিনই তিনি চলে গেলেন। গ্রামের সমস্ত লোক জানলে মহারাজ হত্যাকারী।

দেবীপ্রসাদ এ ঘটনায় কোনও দুঃখ করলে না। তার সুন্দরী মেয়ে মহারাজের মন হরণ করেছে, তিনি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাবেন এমনি সব কথা সগৌরবে সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগলো। এর পর থেকেই প্রতি মাসে মহারাজ মতির নামে টাকা পাঠাতেন বলে দেবীপ্রসাদের কথা কেহই আর অবিশ্বাস করতো না। এমন কি মতি নিজেও ক্রমে ক্রমে বাপের কথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে, তাকে দু এক দিন সত্য কথা বোঝাতে চাইলুম; সে আমার মন্দিরে আসাই বন্ধ করে দিলে।

এমনি করে দুবছর কেটে গেল। মহারাজ এলেন না বা মতিকে নিয়ে গেলেন না দেখে দেবীপ্রসাদ মতিকে দিয়ে মহারাজকে এক খানা পত্র লিখিয়ে যে উত্তর পেল, তাতে সে নিজে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো আশা ভঙ্গের আঘাতে। আর মতিটা গেল একেবারে পাগল হয়ে, মেয়ের ওই অবস্থায় বিছানায় পড়ে দেবীপ্রসাদ কিছুদিন ভুগে মহারাজকে যথেচ্ছা গাল দিয়ে তাঁরই পাঠান টাকায় যতটুকু সম্ভব সেবা পথ্য ভোগ করে মারা গেল। আমার চিঠিতে তার মৃত্যুর খবর পেয়ে, গেল বছর মহারাজ এখানে এসেছিলেন মতিকে দেখা শোনা করবার ভার আমাকে নেবার জন্য অনুরোধ কর্ত্তে। তার পর এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।'

পুরোহিত তাঁহার কথা শেষ করিয়া সীমার দিকে চাহিলেন; কিন্তু সে মুখে এমন কোন চিহ্ন ছিল না যাহাতে তাঁহার এই মাত্র সমাপ্ত কথাগুলি তাহার জ্ঞানের দ্বারে পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

তিনি বেদনা-ম্লান দৃষ্টিতে মহারাজের মৃতকল্প মুখের দিকে

তিনি একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া বাহিরে উষার কোমল আলো দেখিয়া গৃহের সকলেই যেন রাত্রির সঞ্চিত অন্ধকারের সহিত পুঞ্জিত আশঙ্কাকেও মিলাইতে দেখিয়া স্বস্তিবোধ করিল।

নিশীথের অন্ধকারে যে অশরীরী আত্মার আগমন অনুভব করিয়া একটা অকারণ আশঙ্কায় সমস্ত মন অচ্ছন্ন হইয়াছিল, দিবালোকে তাহাকে আর খুজিয়া মিলিল না। সকলেরই মনে হইল এই স্বপ্রকাশ আলোয় জীবন-চোরের নিঃশব্দ হরণ আর গোপন রহিবে না।

জীবন-মরণের সম্মুখীন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন জীবনকেই অনুভব করিল।

ডাক্তার আসিয়া মহারাজকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'আর ভয় নাই'

সকলেই আনন্দোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখিল, মহারাজের জীবন-প্রবাহ তাঁহার দেহে সজীবতার সৃষ্টি করিয়াছে।

মিসেস মিত্র উঠিয়া গিয়া দুই হাতে সীমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার দুটি চোখে অবারিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই লেখিকার লেখা—

১। উৎসর্গিতা … (যন্ত্রস্থ)

২। ব্যথা-বৈচিত্র্য … (যন্ত্রস্থ)